নবী-রাসুল সিরিজ-৭

কাসাসুল কুরআন-৭

হযরত যুলকিফ্‌ল আ.

হযরত উযায়ের আলাইহিস সালাম
হযরত যাকারিয়া আলাইহিস সালাম
হযরত ইয়াহ্‌ইয়া আলাইহিস সালাম

মূল
মাওলানা হিফযুর রহমান সিওহারবি রহ.
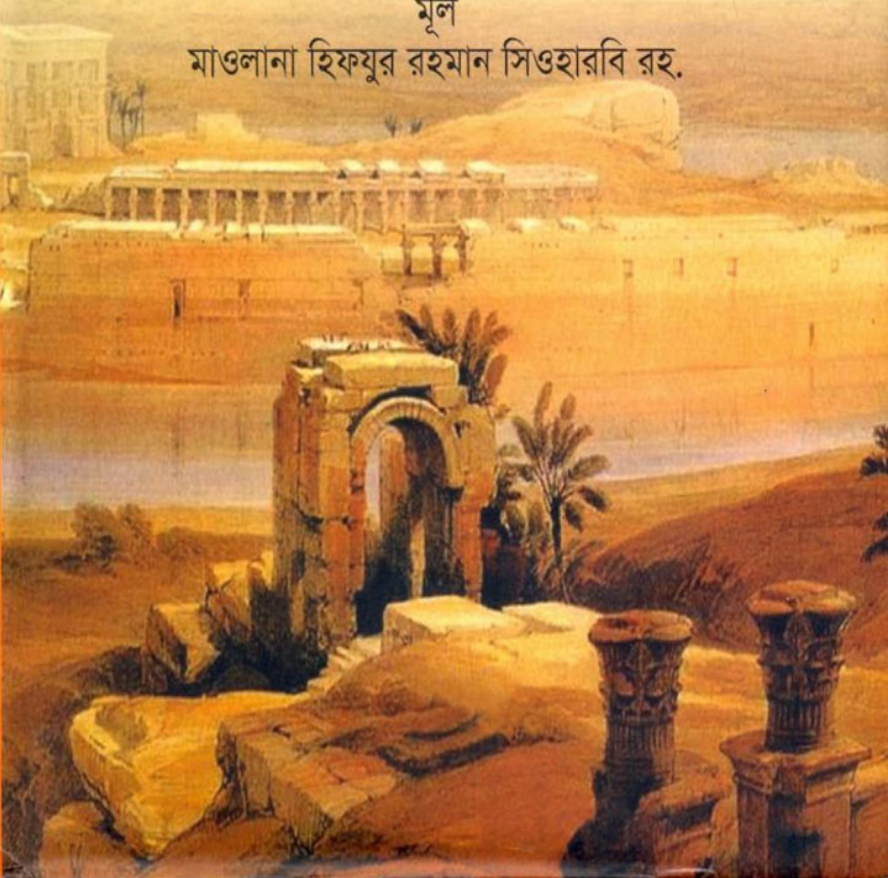
নবী-রাসুল সিরিজ-৭

কাসাসুল কুরআন-৭

হযরত যুলকিফ্‌ল আলাইহিস সালাম
হযরত উযায়ের আলাইহিস সালাম
হযরত যাকারিয়া আলাইহিস সালাম
হযরত ইয়াহ্‌ইয়া আলাইহিস সালাম

আসহাবুল জান্নাহ
মুমিন ও কাফের
আসহাবুল কারইয়াহ অথবা আসহাবু ইয়াসিন

মূল
মাওলানা হিফযুর রহমান সিওহারবি রহ.

অনুবাদ
মাওলানা আবদুল্লাহ আল ফারূক
মাওলানা আবদুস সাত্তার আইনী

কাসাসুল কুরআন-৭
মাওলানা হিফযুর রহমান সিওহারবি রহ.

অনুবাদ
মাওলানা আবদুল্লাহ আল ফারুক

সম্পাদনা
মাকতাবাতুল ইসলাম সম্পাদনা বিভাগ

প্রকাশক
হাফেজ কুতুবুদ্দীন আহমাদ

প্রথম প্রকাশ
সেপ্টেম্বর, ২০১৫ খ্রি.

প্রচ্ছদ ॥ তকি হাসান

সার্বিক যোগাযোগ
মাকতাবাতুল ইসলাম
[সেরা মুদ্রণ ও প্রকাশনার অগ্রপথিক]

প্রধান বিক্রয়কেন্দ্র
৬৬২ আদর্শনগর, মধ্যবাড্ডা
ঢাকা-১২১২
০১৯১১৬২০৪৪৭
০১৯১১৪২৫৬১৫

বাংলাবাজার বিক্রয়কেন্দ্র
ইসলামি টাওয়ার (২য় তলা)
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
০১৯১২৩৯৫৩৫১
০১৯১১৪২৫৮৮৬

মূল্য : ১০০ [একশত] টাকা মাত্র

QASASUL QURAN [7]
Writer : Mawlana Hifjur Rahman RH
Translated by : Abdullah Al Faruque
Published by : Maktabatul Islam
Price : Tk. 100.00
ISBN : 978-984-90977-7-8
www.facebook/Maktabatul Islam
www.maktabatulislam.net

সূচিপত্র

হযরত ইয়াহ্ইয়া আলাইহিস সালাম

সুরা আল-ক্বালাম এবং আসহাবুল জান্নাহ

মুমিন ও কাফের

আসহাবুল কারইয়াহ অথবা আসহাবু ইয়াসিন

হযরত যুলকিফ্ল আলাইহিস সালাম
হযরত উযায়ের আলাইহিস সালাম
হযরত যাকারিয়া আলাইহিস সালাম
হযরত ইয়াহ্ইয়া আলাইহিস সালাম
আসহাবুল জান্নাহ
মুমিন ও কাফের
আসহাবুল কারইয়াহ অথবা আসহাবু ইয়াসিন

কুরআনে হযরত যুলকিফ্‌ল আ.-এর আলোচনা

পবিত্র কুরআনে হযরত যুলকিফল আ.-এর আলোচনা দুটি সুরা, আম্বিয়া ও সাদে করা হয়েছে। উভয় সুরায় শুধু নাম উল্লেখ করা হয়েছে। সংক্ষিপ্ত বা বিশদ কোনো প্রকার বৃত্তান্ত উল্লেখ করা হয় নি।

وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا الْكِفْلِ كُلٌّ مِنَ الصَّابِرِينَ () وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ

'এবং ইসমাইল, ইদরিস ও যুলকিফলের কথা স্মরণ করুন, তাঁরা প্রত্যেকেই ছিলেন সবরকারী।' [সুরা আম্বিয়া : আয়াত ৮৫]

وَاذْكُرْ إِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَذَا الْكِفْلِ وَكُلٌّ مِنَ الْأَخْيَارِ

'আর স্মরণ করুন ইসমাইল, আল ইয়াসাআ ও যুলকিফলের কথা; তাঁরা প্রত্যেকেই ছিলেন নেককার লোকদের অন্তর্ভুক্ত। [সুরা সাদ : আয়াত ৪৮]

বংশপরিক্রমা

ইতোপূর্বে বলা হয়েছে, হযরত যুলকিফল সম্পর্কে পবিত্র কুরআন নাম ছাড়া আর কিছুই উল্লেখ করে নি। তদ্রূপ নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকেও কোনো কিছু বর্ণিত নেই। কাজেই কুরআন ও হাদিসের আলোকে এর থেকে বেশি কিছু বলা যায় না যে, হযরত যুলকিফল আ. আল্লাহর মনোনীত নবী ছিলেন এবং কোনো এক জাতিকে পথ দেখানোর জন্য প্রেরিত হয়েছিলেন। এর অতিরিক্ত কোনো তথ্য নেই। ঐতিহাসিক তথ্যের ক্ষেত্রে দ্বিতীয় স্তরের উৎস হলো জীবনচরিত ও ইতিহাসগ্রন্থ। যথেষ্ট অনুসন্ধান ও খোঁজাখুজির পরও এমন কোনো তথ্য আমাদের হাতে এসে পৌঁছে নি যার মাধ্যমে হযরত যুলকিফল আ.-এর বিবরণ ও অবস্থার ওপর আলোকপাত করা যায়। এক্ষেত্রে তাওরাতও যেমন নীরব, তেমনি ইসলামের ইতিহাসও।

হযরত যুলকিফ্‌ল সম্পর্কে সাহাবিদের বাণী ও রেওয়ায়েত

তবে প্রখ্যাত মুফাসসির তাবেঈ হযরত মুজাহিদ রহ. থেকে ইবনে জারির হযরত যুলকিফল আ.-সম্পর্কিত একটি ঘটনা বর্ণনা করেছেন। হযরত

আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. ও হযরত আবু মুসা আশআরি রা. থেকেও কয়েকটি বর্ণনা ইবনে আবি হাতেম নকল করেছেন। এগুলোর সনদ মুনকাতে।[১] মুজাহিদ রহ.-এর বর্ণনা হলো, ইসরাইলি নবী হযরত আল ইয়াসাআ আ. যখন বয়োবৃদ্ধ হয়ে পড়েন, তখন একদিন তিনি বলেন, হায়, যদি আমার জীবদ্দশায় এমন কাউকে পেতাম যে আমার স্থলাভিষিক্ত হতে পারতো। তখন আমি আশ্বস্ত বোধ করতাম যে, আমার প্রতিনিধিত্ব করার মতো যোগ্য লোক আছে। এরপর তিনি বনি ইসরাইলিদের একটি সভা আহ্বান করেন। সেখানে তিনি বলেন, আমি তোমাদের মধ্য হতে এক ব্যক্তিকে আমার স্থলাভিষিক্ত করে যেতে চাই। তবে শর্ত হলো, তাকে আমার সঙ্গে তিনটি অঙ্গীকার করতে হবে। ১. দিনভর রোযা রাখবে। ২. রাতে আল্লাহর স্মরণে নিমগ্ন থাকবে। ৩. কখনো রাগ করবে না। তাঁর এ কথা শুনে একজন অতিশয় সাধারণ ব্যক্তি দাঁড়িয়ে গেলেন, জনতার চোখে লোকটি মর্যাদার অধিকারী ছিলেন না। তিনি নিবেদন করলেন, এই খেদমতের জন্য আমি প্রস্তুত। হযরত আল ইয়াসাআ আ. তিনটি শর্ত দ্বিতীয়বার বয়ান করে জিজ্ঞেস করলেন, 'এগুলো নিয়মানুবর্তিতার সঙ্গে পালন করতে পারবে তো?' লোকটি উত্তর দিলেন, 'অবশ্যই'। সে দিনের মতো সভা শেষ হলো।

দ্বিতীয় দিন হযরত আল ইয়াসাআ আ. পুনরায় সভা ডাকলেন এবং গতকালের কথাগুলোর পুনরাবৃত্তি করলেন। আজকেও গতকালের মতো সবাই নিশ্চুপ। শুধু গতকালের সেই লোকটি অগ্রসর হয়ে নিজেকে খেদমতের জন্য পেশ করলেন এবং ওই তিন শর্ত পালন করার অঙ্গীকার করলেন। তখন হযরত আল ইয়াসাআ আ. তাঁকে তাঁর স্থলাভিষিক্ত মনোনীত করলেন। শয়তান যখন দৃশ্যটি দেখছিলো তখন তার কিছুতেই সহ্য হচ্ছিলো না। সে তার অনুগতদের ডেকে নির্দেশ দিলো, এমন অবস্থা তৈরি করো যেনো এ লোকটি পথ হারিয়ে ফেলে এবং শর্তপালন করতে না পারে। তার নির্দেশ মেনে শয়তানের চেলারা অনেক চেষ্টা করলো, কিন্তু কিছুতেই তারা সফল হলো না। তখন শয়তান বললো, আমি নিজেই এ কাজ করতে পারবো। তাকে আমি অঙ্গীকার পূরণ করতে দেবো না।

---

[১]. অর্থাৎ বর্ণনাকারী আর ওই দুই সাহাবির মাঝখানে যারা ভায়া হয়েছিলেন, তাদের কারো কারো নাম উল্লেখ নেই। সেই নামগুলো সংগ্রহ করা গেলে বর্ণনার সনদটি মুত্তাসিল তথা অবিচ্ছিন্ন সূত্রবিশিষ্ট হতে পারতো। বিচ্ছিন্ন সূত্রের বর্ণনাকে পরিভাষায় মুনকাতে বলা হয়ে থাকে।

হযরত আল ইয়াসাআ আ.-এর খলিফার অভ্যাস ছিলো, তিনি দিনে ও রাতে শুধু দ্বিপ্রহরে অল্প সময় ঘুমিয়ে শরীরের ক্লান্তি দূর করতেন। একদিন শয়তান জীর্ণ-শীর্ণ পোশাকে একজন বয়োবৃদ্ধের আকৃতি ধারণ করে ঠিক সেসময় তার দুয়ারে উপস্থিত হয়ে কড়া নাড়লো। খলিফা তখন বিশ্রাম ছেড়ে উঠে এলেন এবং জিজ্ঞেস করলেন, কে তুমি? শয়তান বললো, আমি একজন অসহায় মজলুম। তিনি দরজা খুলে দিয়ে তার অবস্থা সম্পর্কে জানতে চাইলেন। শয়তান বললো, আমার জাতির সঙ্গে আমার ঝগড়া রয়েছে। তারা আমার ওপর জুলুম করেছে। শয়তান বানোয়াট জুলুমের এত দীর্ঘ কাহিনি বয়ান করলো যে, তার ঘুমের সময় শেষ হয়ে গেলো। বনি ইসরাইলের দায়িত্বপ্রাপ্ত খলিফা বললেন, তুমি এখন চলে যাও। সন্ধ্যার সভায় এসো। সেখানে আমি তোমার অধিকার আদায় করবো। আগন্তুক চলে গেলো। সন্ধ্যার আসরে দেখা গেলো লোকটি আসে নি। সভা শেষ হওয়া পর্যন্ত তিনি তার অপেক্ষা করলেন, কিন্তু লোকটি এলো না। সকালে যখন তিনি সভায় বসেন তখনও তিনি চারপাশে মনোযোগ দিয়ে দেখলেন যে, লোকটি এলো কিনা? কিন্তু তখনও তার কোনো হদিস নেই। সভা শেষ হওয়ার পর যখন তিনি বিশ্রামের জন্য ঘরের ভেতরে চলে গেলেন, তখন হঠাৎ দরজার কড়া বেজে উঠলো। তিনি দরজা খুলতেই কালকের বৃদ্ধ লোকটিকে দেখতে পেলেন। গতকালের মতো আজকেও সে তার দুঃখের বলতে লাগলো। তখন খলিফা বললেন, আমি তোমাকে গতকাল সন্ধ্যার সভায় আসতে বলেছিলাম। কিন্তু তুমি তো এলে না। তখন আগন্তুক বললো, আমার জাতি খুবই বজ্জাত। যখন তারা আপনাকে সভায় বসতে দেখে তখন তারা চুপিসারে আমার কাছে এসে স্বীকার করে যায় যে, তুমি তার কাছে আমাদের ঝগড়ার কথা তুলো না। আমরা তোমাকে তোমার অধিকার দিয়ে দেবো। কিন্তু আপনার সভা শেষ হতেই তারা আগের মতো অস্বীকার করে বসে। খলিফা বললেন, তাহলে আজকের সন্ধ্যার সভায় অবশ্যই আসবে। সেখানে আমি নিজে থেকে তোমার অধিকার আদায় করবো। আজকের আলাপচারিতায়ও ঘুমের সময় নষ্ট হয়ে যায়। ঘুমের ব্যাঘাতের কারণে খলিফা খুবই কষ্টবোধ করেন। তারপরও তিনি অঙ্গীকার মোতাবেক সন্ধ্যায় সভা আহ্বান করলেন। কিন্তু সন্ধ্যাকালীন মজলিসে বিচারে বসে তিনি চারপাশে চোখ বুলিয়ে বৃদ্ধ লোকটিকে দেখতে পেলেন না। বৃদ্ধ লোকটি আজো আসে নি। এভাবে সে সকালের সভাতেও যোগদান করলো না। তৃতীয় দিন যখন তার ওপর প্রচণ্ড রকম ঘুম চেপে বসলো, তখন তিনি ঘরের লোকদেরকে জানিয়ে দিলেন যে, আজ দরজায়

যে-ই আসুক না কেনো; আমার বিশ্রামের সময় কিছুতেই দুয়ায় খুলবে না। এ কথা বলে তিনি শুয়ে পড়লেন। মাত্র দু-চোখের পাতা বুঝে এসেছে, এসময় শয়তান পূর্বের বৃদ্ধ লোকের আকৃতি ধারণ করে বাড়ির ফটকে এসে উপস্থিত হলো এবং কড়া নাড়তে লাগলো। ভেতর থেকে সংবাদ এলো যে, আজ খলিফা নির্দেশ, কারো জন্যই দরজা খোলা যাবে না। শয়তান বললো, আমি দু-দিন ধরে আমার একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে হাজির হচ্ছি। খলিফা আমাকে এ সময় আসতে বলেছিলেন। কাজেই ফটক খুলে দাও। কিন্তু দরজা খোলা হলো না। ঘরের লোকজন বিস্ময়ের সঙ্গে দেখতে পেলো যে, বাইরের দরজা বন্ধ হওয়া সত্ত্বেও লোকটি কীভাবে যেনো ভেতরে চলে এসেছে এবং খলিফার বিশ্রামের ঘরের দুয়ারে হাজির হয়ে কড়া নাড়ছে। খলিফা দরোজা খুলে দিলেন এবং ঘরের লোকদের জিজ্ঞেস করলেন, আমি তোমাদেরকে দরজা খুলতে নিষেধ করেছিলাম। তারপরও লোকটি কীভাবে প্রবেশ করলো। এ কথা বলার সময় তার দরজার ওপর দৃষ্টি পড়তেই তিনি দেখলেন, দরজা বন্ধ। অবাক বিস্ময়ে তিনি বুড়ো লোকটিকে কাছ থেকে খুটিয়ে লক্ষ্য করতেই আসল রহস্য বুঝে ফেললেন। তখন তিনি শয়তানকে সম্বোধন করে বললেন, ওহে আল্লাহর দুশমন, তুই কি ইবলিস? শয়তান স্বীকার করলো, হ্যাঁ, আমি ইবলিস। আপনি আমাকে সর্বদিক থেকে হারিয়ে দিলেন। যখন আমার সন্তান ও অনুগতরা কোনোভাবে আপনাকে কাবু করতে পারছিলো না, তখন আমি এই সর্বশেষ পন্থাটি গ্রহণ করেছিলাম। যাতে আপনাকে ক্রুদ্ধ করে তুলতে পারি। তাহলে আমি আপনার অঙ্গীকার পূরণে ব্যর্থ হতেন। কিন্তু হায় আফসোস, আজ আমাকেও ব্যর্থ হতে হলো। উল্লিখিত ঘটনার ভিত্তিতে মহান আল্লাহ তাঁকে 'যুলকিফল' নামে প্রসিদ্ধি দান করেন। কেননা, তিনি হযরত আল ইয়াসাআ আ. থেকে যে শর্তসমূহ পালন করার কাফালত [জামানত] নিয়েছিলেন, সেটি পূর্ণ করেছিলেন।[২]

সমালোচনা ও নিরীক্ষণ

মুজাহিদ রহ.-এর এই রেওয়ায়েত সনদের বিচারে আপত্তিকর এবং প্রমাণ হিসেবেও গ্রহণযোগ্য নয়। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস ও আবু মুসা আশআরি রা. হতে যে বর্ণনা পাওয়া যায়, সেটিও মুনকাতে এবং সনদের বিচারে আপত্তিকর। কাজেই এগুলোকে আমরা একটি গল্পের অতিরিক্ত আর কিছু বলতে পারবো না। কারণ, পবিত্র কুরআন হযরত যুলকিফল আ.-এর

---

২. তাফসিরে ইবনে কাসির : ৩/১৯০-১৯১

পূর্ণ বৃত্তান্ত ও বিবরণ না দিলেও তাঁকে ইতিহাসের মহান নবী-রাসুলদের তালিকায় গণ্য করেছে। কাজেই হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. ও হযরত আবু মুসা আশআরি রা.-এর মতো উঁচু মাপের সাহাবি এবং হযরত মুজাহিদ রহ.-এর মতো একজন শীর্ষস্থানীয় তাবেঈ থেকে এটা আশা করা যায় না যে, তাঁরা তার সম্পর্কে এ কথা বলবেন যে, তিনি নবী ছিলেন না। বরং একজন নেককার লোক ছিলেন। যেমনটি এই তিন বুযুর্গ থেকে ইবনে কাসির বর্ণনা করেছেন।

হযরত শাহ আবদুল কাদির রহ. বলেন, হযরত যুলকিফল আ. ছিলেন হযরত আইয়ুব আ.-এর পুত্র। তিনি আল্লাহর ওয়াস্তে জনৈক ব্যক্তির হয়ে জামানত নিয়েছিলেন। যার দণ্ড হিসেবে তাঁকে কয়েক বছর কয়েদি থাকার কষ্ট সহ্য করতে হয়েছিলো। তিনি লিখেছেন, জনশ্রুতি রয়েছে, হযরত যুলকিফল ছিলেন আইয়ুব আ.-এর ছেলে। জনৈক ব্যক্তির জামিন হওয়ার কারণে তাকে কয়েক বছর বন্দি থাকতে হয়েছিলো। শুধু আল্লাহর দিকে তাকিয়ে তিনি এই ত্যাগটুকু স্বীকার করেছিলেন।[৩]

আমাদের সমকালীন কয়েকজন মুফাসসিরের অভিমত হলো, যুলকিফল হযরত হিযকিল আ.-এর উপাধি। সমকালীন আরেক বুদ্ধিজীবী এক ধাপ এগিয়ে বিস্ময়কর মন্তব্য করে বলেছেন, যুলকিফল গৌতম বুদ্ধের উপাধি। কেননা, তার রাজধানীর নাম হচ্ছে, ক্যাপল। আরবিতে যার উচ্চারণ দাঁড়ায়, কিফল। আর ذو শব্দের অর্থ হলো, মালিক। যেভাবে সম্পদশালীর জন্য ذو المال এবং কোনো নগরীর জমিদারের জন্য ذو بلدِ শব্দের ব্যবহার প্রচুর। এখানেও ক্যাপল নগরীর অধিপতি ও জমিদারকে 'যুলকিফল' বলা হয়েছে। সমকালীন এই বুদ্ধিজীবী এ দাবিও করেছেন যে, গৌতম বুদ্ধের আসল শিক্ষা ছিলো এক আল্লাহর তাওহিদ ও বিশুদ্ধ ইসলামি শিক্ষা। অন্যান্য ধর্মের সঙ্গে সংমিশ্রণের ফলে তার ধর্ম আসল রূপ হারিয়ে বিকৃত হয়ে বর্তমানের কাঠামোতে নেমে এসেছে।

তাঁর এই অভিমত অনুমানভিত্তিক; ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে এর কোনো তাৎপর্য নেই।

আমাদের মধ্যে কোনো ধরনের হঠকারিতা নেই। বাস্তবেই যদি বিশুদ্ধ ইতিহাসের আলোকে এ কথা প্রমাণিত হয় যে, পবিত্র কুরআন যেসকল নবীর শুধু নাম উল্লেখ করেছে, তার প্রতিপাদ্য হলো অমুক অমুক ব্যক্তি।

---

[৩]. তাফসিরে মূদেহুল কুরআন, সুরা আম্বিয়া

তাহলে 'ইতোপূর্বে কোনো ব্যক্তি কেনো এ কথা বলে নি, কাজেই তা মানবো না'; এ কথা বলে আমরা সেই ইতিহাসের আলোকে প্রমাণিত কথা প্রত্যাখ্যান করবো না। নিঃসন্দেহে আমরা এ বাস্তবতাকে স্বীকার করি যে, ঐতিহাসিক তথ্য-উপাত্ত অনুসন্ধানের দুয়ার বন্ধ হয়ে যায় নি। প্রত্যেহ নিত্যনতুন তথ্য উদ্‌ঘাটিত হয়ে সম্মুখে আসছে। নতুন নতুন অনেক তথ্য-উপাত্ত আবিষ্কৃত হচ্ছে। বরং এর মাধ্যমে পবিত্র কুরআন ও হাদিসে রাসুলে যেসব ঘটনার বর্ণনা এসেছে, নতুন আবিস্কারের মাধ্যমে আজ তার সত্যতা প্রমাণিত হচ্ছে। অথচ এতদিন নাস্তিকরা এই অজুহাতে সেগুলো অস্বীকার করে যাচ্ছিলো যে, 'প্রাচীন ইতিহাস ও ঐতিহাসিক দর্শনে সেগুলোর উল্লেখ নেই'। কাজেই পবিত্র কুরআনে আলোচিত কোনো ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে যদি আধুনিক আবিস্কারের মাধ্যমে অতিরিক্ত কোনো তথ্য উদ্‌ঘাটিত হয় তাহলে আমরা তা কিছুতেই অস্বীকার করবো না। বরং প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে এটিকে সংযোজিত দলিল হিসেবে পেশ করবো। কিন্তু উল্লিখিত বাস্তবতাকে স্বীকার করার অর্থ এ নয় যে, কোনো ব্যক্তি দাঁড়িয়ে নিজের কল্পিত ধারণা ও অনুমানের ভিত্তিতে কোনো ঐতিহাসিক ঘটনা সম্পর্কে বিনা প্রমাণে একটি দাবি করে বসবে, আর আমাদেরকে তা মেনে নিতে হবে। হযরত যুলকিফলকে গৌতম বুদ্ধ মন্তব্য করা এখন পর্যন্ত ওই অবস্থান থেকে অধিক কোনো তাৎপর্য রাখে না।

দুনিয়ার বিভিন্ন প্রান্তে মহান আল্লাহ যেসকল নবী-রাসুল পাঠিয়েছেন, তাদের ওপর ঈমান আনার জন্য পবিত্র কুরআনের এই তিনটি দফাই আমাদের জন্য যথেষ্ট। যে তিন দফা হলো সত্য ধর্ম ইসলামের স্বকীয় প্রতীক।

১. وَإِنْ مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ : এমন কোনো জাতি অতিবাহিত হয় নি, যাদের মধ্যে মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে কোনো ভীতি প্রদর্শনকারী আগমন করে নি।

২. مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ : নবীদের মধ্য হতে আমি তোমাকে কারো (নাম নিয়ে) আলোচনা শুনিয়েছি। আর কারো ঘটনা তোমাকে শোনাই নি।

৩. لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ : (কাজেই একজন মুমিনের বিশ্বাস হতে হবে) আমরা আল্লাহর নবীদের মধ্য হতে কোনো নবীর ক্ষেত্রে ফারাক করি না। অর্থাৎ তাদের সবার ওপর ঈমান রাখি।

এই পরিষ্কার ও স্বচ্ছ আকিদার পর যদি আমাদের সামনে কোনো দেশ ও কোনো অঞ্চলের নবী-রাসুলদের ঘটনা নাও আসে, তাহলে তার কারণ যাই হোক না কেনো, উল্লিখিত সংক্ষিপ্ত তথ্যই তাদের ওপর আমাদের ঈমান আনার জন্য যথেষ্ট। আমাদের মূল লক্ষ্য অর্থাৎ হেদায়েতের জন্য, আল্লাহর প্রতি ঈমান আনার জন্য, নেক কাজ করার জন্য তাঁদের পূর্ণ বিবরণ জানাটা আবশ্যক নয়। বিশেষ করে, যখন মহান আল্লাহ আমাদের সামনে এই সত্য স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম 'খতামুন নাবিয়্যিন' তথা সর্বশেষ নবী। আমরা সকল সত্য ধর্মের বিশুদ্ধ ও প্রকৃত শিক্ষাকে স্বীকার করি। সেই শিক্ষা উন্নতি করে ইসলাম নামক পূর্ণতার স্তরে আরোহণ করেছে। কুরআনের ভাষায়—

اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِيْ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِيْنًا

'আজ তোমাদের জন্য তোমাদের দীন পূর্ণাঙ্গ করলাম ও তোমাদের প্রতি আমার অনুগ্রহ সম্পূর্ণ করলাম এবং ইসলামকে তোমাদের দীন মনোনীত করলাম।' [সুরা মায়েদা : আয়াত ৩]

মোটকথা, আমরা স্বীকার করি, ভারতবর্ষেও আল্লাহর সত্য নবী ও মহান পয়গম্বর প্রেরিত হয়েছেন। এমনকি সিরাতের বর্ণনার ভাষ্য অনুযায়ী আদিপিতা হযরত আদম আ. ভূস্বর্গীয় এই ভারতের কোনো এক প্রান্তে অবতরণ করেছিলেন। কিন্তু যতক্ষণ কুরআন ও হাদিসের সুস্পষ্ট ঘোষণা অথবা ইতিহাসের কোনো বিশুদ্ধ দলিল-উপাত্তের আলোকে এ কথা প্রমাণিত না হবে যে, যুলকিফল হলো গৌতমবুদ্ধের উপাধি, ততক্ষণ নিরেট ধারণা ও অনুমানের ভিত্তিতে সেটাকে আমরা স্বীকার করতে পারি না। কেননা, একজন নবীকে নবী বলে স্বীকার না করা যেভাবে কুফরি একজন অ-নবীকে নবী বলে স্বীকার করাও অনুরূপ কুফরি।

একটি ভুল সংশোধন

ইমাম আহমদ বিন হাম্বল রহ. তাঁর মুসনাদে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. থেকে একটি রেওয়ায়েত নকল করেছেন। তিনি বলেন, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একবার ইরশাদ করেছেন, বনি ইসরাইলে কিফল নামে এক ব্যক্তি ছিলো। লোকটি ছিলো চরম ফাসেক ও পাপাচারী। এক বার তার কাছে একজন সুন্দরী মহিলা এলো। কিফল তাকে ষাট স্বর্ণমুদ্রা দিয়ে যিনা করতে রাজি করিয়ে ফেললো। কিন্তু লোকটি সেই সুন্দরী নারীর সঙ্গে পাপকাজ করতে উদ্যত হতেই নারীর গোটা দেহে

কম্পন শুরু হয়ে গেলো। দু-চোখের জল ফেলে সে কাঁদতে লাগলো। কিফল তাকে জিজ্ঞেস করলো, কেনো তুমি কাঁদছো? তুমি কি আমাকে ঘৃণা করো? নারী উত্তর করলো, তা নয়। আসল কথা হলো, আমি আমার গোটা জীবনে কখনো এই বদকাজ করি নি। কিন্তু আজ প্রয়োজন ও পেটের ক্ষুধায় বাধ্য হয়ে নিজের সতীত্ব জলাঞ্জলি দিচ্ছি। সেই বেদনাদায়ক চিন্তা আমাকে ক্ষতবিক্ষত করছে। যার কারণে আমি কাঁদতে বাধ্য হয়েছি। কিফল কথাটি শুনতেই তৎক্ষণাৎ তার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলো এবং বললো, যে বদকাজ তুমি কখনো করো নি, আজ শুধু পেটের দায়ে করতে বাধ্য হয়েছো, সেই কাজ তোমাকে করতে হবে না। যাও পূর্ণ সতীত্ব ও পবিত্রতাসহ ঘরে ফিরে যাও। এই স্বর্ণমুদ্রারও তুমি মালিক। নিজের প্রয়োজনে ব্যয় করো। কিফল আরো বললো, আল্লাহর কসম, আজ এ মুহূর্ত থেকে কিফল আর আল্লাহর নাফরমানি করবে না। ঘটনাচক্রে সে রাতেই কিফলের মৃত্যু হলো। সকালে লোকেরা দেখতে পেলো যে, তার ঘরের দুয়ারে একটি অদৃশ্য হাত এ সুসংবাদ লিখে দিয়েছে, 'কিফলকে নিঃসন্দেহে আল্লাহ ক্ষমা করে দিয়েছেন'।

উল্লিখিত বর্ণনায় শুধু কিফল এসেছে। যুলকিফল আসে নি। তিনি হযরত যুলকিফল নন; অন্যকোনো ব্যক্তি হবেন। কাজেই এই ভুল বুঝার সুযোগ নেই যে, এটি বোধ হয় হযরত যুলকিফলের ঘটনা।

শিক্ষা ও উপদেশ

১। ইসলামই এমন একটি ধর্ম যেখানে তার সত্য আহ্বানের বুনিয়াদ হলো, দেশ, জাতীয়তা, বংশীয় আভিজাত্যের ঊর্ধ্বে উঠে এ স্বীকারোক্তি দিতে হবে যে, সত্যের আহ্বান তার বুনিয়াদের ক্ষেত্রে কোনো সীমারেখা ও সাম্প্রদায়িকার মুখাপেক্ষী নয়। এক্ষেত্রে সে কোনো গোষ্ঠীর ইজারাদারি মেনে নেয় না। কারণ হলো, মহান আল্লাহর সত্তা যেমন একক ও অদ্বিতীয়, তেমনি সন্দেহাতীতভাবে তার সত্যের পয়গামও একটাই হতে হবে। এবং প্রকৃতপক্ষেও সেটা এক। তার সত্য বার্তা অনাদিকাল থেকে আজ অবধি সাদা-কালো, আরব-অনারব, এশিয়ান-ইউরোপিয়ান-আমেরিকান-আফ্রিকান অর্থাৎ সকল সংকীর্ণতার ঊর্ধ্বে, যে-কোনো বৈষম্য ও অন্যায্যতার শৃঙ্খল ডিঙিয়ে সবার জন্য সমান প্রযোজ্য।

তবে প্রতিটি যুগের অবস্থা ও পরিবেশ, সময়ের চাহিদা ও কালের আবেদন, উপরন্তু বিভিন্ন জাতি ও গোষ্ঠীর বিকাশ ও উন্নতি এবং তাদের চৈন্তিক ও ব্যবহারিক যোগ্যতার প্রেক্ষাপটে তাতে এই বৈচিত্র অবশ্যই রয়েছে –এবং

তা থাকাও উচিত যে, তার মৌলিক বুনিয়াদ ও ভিত্তিমূলে কোনো আঁচড় না ফেলে সেই সত্য বার্তার শাখা-প্রশাখা ও আনুষঙ্গিক বিষয়াবলি ভিন্ন হবে। উদ্দেশ্য হলো, যেনো তার অনুসারীর আত্মিক বিকাশ উন্নতির শিখর স্পর্শ করে। এভাবে মানবিক চিন্তা ও দৃষ্টিভঙ্গির উপলব্ধি শীর্ষদেশে পৌঁছতে সক্ষম হয়।

কাজেই দীনি ও রুহানি পরিভাষায় সত্যের পয়গামের সেই অপরিবর্তনশীল সত্যকেই 'দীন' বলা হয়। মহান আল্লাহ যার শিরোনাম দিয়েছেন, ইসলাম। ইরশাদ হয়েছে—

إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ

'নিশ্চয়ই ইসলামই আল্লাহর নিকট একমাত্র দীন।' [সুরা আলে ইমরান : আয়াত ১৯]

وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ

'আর যে ব্যক্তি ইসলাম ব্যতীত অন্য দীন গ্রহণ করতে চাইবে, তার সে চাওয়া কখনই কবুল করা হবে না।' [সুরা আলে ইমরান : ৮৬]

هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِن قَبْلُ

'তিনি পূর্বে তোমাদের নামকরণ করেছেন 'মুসলিম'।' [সুরা হজ্জ : ৭৮]

উল্লিখিত সত্য বার্তার সেই পরিবর্তনশীল অবস্থা এবং সময়ের চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে অবতারিত তার শাখা-প্রশাখা ও আনুষঙ্গিক বিষয়াবলির নামই হলো, শরিয়ত। যার সম্পর্কে ইরশাদ হয়েছে—

لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا

তোমাদের প্রত্যেকের জন্য শরিয়ত ও স্পষ্ট পথ নির্ধারণ করেছি।

[সুরা মায়েদা : ৪৮]

আর রূহানি ও দীনি উন্নতি ও ক্রমবিকাশ এবং প্রচার ও প্রসারের পূর্ণতাকে 'দীনের পূর্ণাঙ্গতা' ও 'অনুগ্রহের সম্পূর্ণতা' নামকরণ করা হয়েছে। আল্লাহ ইরশাদ করছেন—

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا

'আজ তোমাদের জন্য তোমাদের দীন পূর্ণাঙ্গ করলাম ও তোমাদের প্রতি আমার অনুগ্রহ সম্পূর্ণ করলাম এবং ইসলামকে তোমাদের দীন মনোনীত করলাম।' [সুরা মায়েদা : আয়াত ৩]

কাজেই আলোচনার সারাংশ হলো, হযরত আদম আ. থেকে শুরু করে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর যুগ পর্যন্ত সকল নবী-রাসুলের দীন তথা খোদার দেয়া বার্তা সর্বযুগে সর্বসময়ে এক ও অভিন্ন ছিলো। যার নাম, ইসলাম। অবশ্য নবী-রাসুলগণের জন্য তাঁদের আপন আপন সময়ে আল্লাহরই পক্ষ থেকে ভিন্ন ভিন্ন আহকাম দেয়া হয়েছিলো। যাকে 'শরিয়ত' ও 'মানহাজ' বলা হয়ে থাকে। যখন আধ্যাত্মিকতার পূর্ণ উন্নতি ঘটে এবং দীনি চিন্তা ও চেতনা পূর্ণতার শীর্ষশিখরে উন্নীত হয় তখন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর মাধ্যমে সেসকল শরিয়তগুলোকে মুহাম্মদি শরিয়তের ভেতর একীভূত করে ফেলা হয়। এই মুহাম্মদি শরিয়তকে স্থান, কাল ও পাত্রের সীমাবদ্ধতার উপরে তুলে গোটা জগৎও সৃষ্টিজীবের ওপর প্রবর্তন করা হয়। ইরশাদ হয়েছে— وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا 'আমি তো তোমাকে সমগ্র মানবজাতির জন্য সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে প্রেরণ করেছি; কিন্তু অধিকাংশ মানুষ জানে না।' [সুরা সাবা : আয়াত ২৮]

এ কারণে ইসলামি শিক্ষার অন্যতম উজ্জ্বলতম দিক হলো, তার ওই ঘোষণা যে, দুনিয়ার প্রতিটি প্রান্তে, প্রতিটি জাতির কাছে আল্লাহর সত্য সুসংবাদদাতা ও ভীতিপ্রদর্শনকারী সত্যের বার্তা নিয়ে আগমন করেছেন। কাজেই প্রত্যেক মুমিন মুসলমানের কর্তব্য হলো, সে এ আকিদা পোষণ করবে যে, আমরা আল্লাহর নবীদের মধ্যে বিভেদের দেয়াল তুলতে ইচ্ছুক নই। একে জায়েযও মনে করি না। যেভাবে আমি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর ওপর ঈমান রাখি, অনুরূপ আল্লাহর অন্য সকল নবীর ওপরও ঈমান রাখি। তাঁদের নাম, ঠিকানা, অবস্থান ও বিবরণ জানা বা না-জানা কোনোরূপ তফাত ফেলে না।

২। মনে হচ্ছে, হযরত যুলকিফল আ. বনি ইসরাইলি নবী ছিলেন। পবিত্র কুরআনে বনি ইসরাইলিদের ইতিহাস ও ঘটনাবলি এজন্যই উল্লেখ করা হয়েছে, যেনো আমরা সেখান থেকে শিক্ষা ও উপদেশ গ্রহণ করি। হয়তো হযরত যুলকিফলের সময়ে দীনের তাবলিগ ও হেদায়েত সংশ্লিষ্ট অথবা শিক্ষা ও উপদেশমূলক বিশেষ কোনো ঘটনা ঘটে নি। যার কারণে পবিত্র কুরআন তার শুধু নাম তুলে ধরাকেই যথেষ্ট মনে করেছে, অতিরিক্ত কোনো বিবরণ বা বৃত্তান্ত জানানোর প্রয়োজনীয়তা বোধ করে নি। আমরা আমাদের বক্ষ্যমাণ গ্রন্থ কাসাসুল কুরআনের একাধিক স্থানে এ বিষয়ের ওপর আলোকপাত করেছি যে, পূর্ববর্তী উম্মতসমূহের ঘটনাবলি ও বিবরণ বয়ান

করার দ্বারা পবিত্র কুরআনের উদ্দেশ্য একটাই। আর তা হলো, এর মাধ্যমে হেদায়েত গ্রহণের ধারাবাহিকতায় শিক্ষা ও নসিহত গ্রহণের ওপর মনোযোগ নিবদ্ধ করা। নয়তো 'ইতিহাস' কুরআনের আলোচ্য বিষয় বা লক্ষ্য; কোনোটাই নয়। এ কারণে কুরআন ইরশাদ করেছে—

كَذَٰلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنۢبَآءِ مَا قَدْ سَبَقَ وَقَدْ آتَيْنَاكَ مِن لَّدُنَّا ذِكْرًا

'পূর্বে যা ঘটেছে তার সংবাদ আমি এভাবে তোমার নিকট বিবৃত করি এবং আমি আমার নিকট হতে তোমাকে দান করেছি উপদেশ।' [সুরা ত্ব-হা : আয়াত ৯৯]

لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ

'তাদের বৃত্তান্তে বোধসম্পন্ন ব্যক্তিদের জন্য আছে শিক্ষা।' [সুরা ইউসুফঃ আয়াত ১১১]

أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ اتَّقَوْا أَفَلَا تَعْقِلُونَ

'তারা কি পৃথিবীতে ভ্রমণ করে নি এবং তাদের পূর্ববর্তীদের কী পরিণাম হয়েছিলো তা কি দেখেনি? যারা মুত্তাকি তাদের জন্য পরলোকই শ্রেয়; তোমরা কি বুঝো না? [সুরা ইউসুফ : আয়াত ১০৯]

وَكُلًّا نَّقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنۢبَآءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَآءَكَ فِي هَٰذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ

রাসুলদের ওই সকল বৃত্তান্ত আমি তোমার নিকট বর্ণনা করেছি, যদ্দারা আমি তোমার চিত্তকে দৃঢ় করি, এর মাধ্যমে তোমার নিকট এসেছে সত্য এবং মুমিনদের জন্য এসেছে উপদেশ ও সাবধানবাণী। [সুরা হুদ : আয়াত ১২০]

হযরত উযায়ের
আলাইহিস সালাম

কুরআনে হযরত উযায়ের আ.-এর আলোচনা

পবিত্র কুরআনে হযরত উযায়ের আ.-এর নাম শুধু সুরা তাওবাতেই এসেছে। বলা হয়েছে যে, ইহুদিরা তাঁকে আল্লাহর পুত্র বিশ্বাস করে। যেভাবে খ্রিস্টানরা হযরত ঈসা আ.-কে আল্লাহর পুত্র জ্ঞান করে থাকে। সুরা তাওবা ছাড়া পবিত্র কুরআনের অন্য কোথাও তাঁর নাম নিয়ে বৃত্তান্ত বা বিবরণ উল্লেখ করা হয় নি। ইরশাদ হয়েছে—

وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ ذَٰلِكَ قَوْلُهُم بِأَفْوَاهِهِمْ يُضَاهِئُونَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَبْلُ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ

'ইহুদিরা বলে, উযায়র আল্লাহর পুত্র। খৃস্টানগণ বলে, মসিহ আল্লাহর পুত্র। এটি তাদের মুখের কথা। পূর্বে যারা কুফরি করেছিলো তারা তাদের মতো কথা বলে। আল্লাহ তাদের ধ্বংস করুন। আর কোন দিকে তাদেরকে ফিরিয়ে দেয়া হয়েছে।' [সুরা তাওবা : আয়াত ৩০]

অবশ্য সুরা বাকারায় একটি ঘটনা রয়েছে। একবার আল্লাহর কোনো এক সম্মানিত বান্দা নিজের গাধার ওপর চড়ে একটি বিধ্বস্ত জনপদের ধ্বংসস্তূপের ওপর দিয়ে যাচ্ছিলেন। সেখানে কোনো বাড়িঘর বা লোক-জন ছিলো না। তবে মুছে যাওয়া বিভিন্ন চিহ্ন সাক্ষ্য দিচ্ছিলো একসময়ের কোলাহলমুখর জনবসতির স্মৃতিকথা। বুযুর্গ তখন এ দৃশ্য দেখে বিস্ময়ে ভাবতে লাগলেন যে, এই ধ্বংসস্তূপ এই বিধ্বস্ত বিরান জনপদ আবার কিভাবে আবাদ হবে? এই মৃত জনপদ আবার কিভাবে প্রাণ ফিরে পাবে? এখানে তো বাহ্যিকভাবে কোনো কার্যকারণ দেখতে পাচ্ছি না। সেই বুযুর্গ ওই ভাবনায় নিমজ্জিত থাকা অবস্থাতেই মহান আল্লাহ ওই স্থানেই তার রুহ কবজ করে ফেললেন এবং তাকে একশো বছর ওই অবস্থাতেই রেখে দিলেন। এই দীর্ঘ সময় অতিক্রান্ত হওয়ার পর তাকে দ্বিতীয়বার জীবন দান করলেন। এরপর তাকে বললেন, বলো, কতক্ষণ তুমি এ অবস্থায় ছিলে? লোকটি প্রথম যখন বিস্মিত অবস্থায় মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েছিলো, তখন ছিলো বেলা শুরুর মুহূর্ত। আর যখন সে দ্বিতীয়বার জীবন ফিরে পায়, তখন পশ্চিমাকাশের সূর্য ডুবু ডুবু করছিলো। যার কারণে তিনি উত্তর দিলেন,

একদিন বা তারও কম সময়। আল্লাহ বললেন, এমন নয়। বরং তুমি এ অবস্থায় একশো বছর কাটিয়ে দিয়েছো। এতে যদি তুমি বিস্মিত বোধ করো, তাহলে তার প্রমাণ দেখো। তোমার একদিকে তোমার ফেলে রাখা খাদ্যসামগ্রী রয়েছে। সেগুলোর প্রতি লক্ষ্য করো, সেখানে বিন্দুমাত্র পরিবর্তন আসে নি। তোমার অন্যদিকে তোমার গাধার প্রতি লক্ষ্য করো, তার দেহ পচে-গলে কেবল কিছু হাড়-গোড়ের কাঠামো বাকি আছে। এর থেকে তুমি আমার কুদরতের আন্দায করে নিতে পারো। যে জিনিসটি আমি সুরক্ষিত রাখতে চেয়েছি, একশো বছরের দীর্ঘ সময়ে কোনো মৌসুমি পরিবর্তন তাকে স্পর্শ করতে পারে নি। অবিকল ও অক্ষুণ্ন থাকতে পেরেছে। আর যে জিনিসের ক্ষেত্রে আমি ইচ্ছে করেছি, তা পচে গলে যাক, তা-ই হয়েছে। আর তোমার চোখের সামনে তোমাকে দ্বিতীয়বার জীবন দান করেছি। এতো কিছু করার কারণ হলো, আমি তোমাকে ও তোমার এ ঘটনাকে লোকদের জন্য 'নিদর্শন' বানাতে চাই। যাতে তুমি বিশ্বাসের সঙ্গে প্রত্যক্ষ করো যে, আল্লাহ তাআলা এভাবেই মৃতকে জীবন দান করেন এবং ধ্বংস হওয়া বস্তুকে দ্বিতীয়বার আবাদ করেন। আল্লাহর মহান সেই বান্দা ওই কুদরতি নিশান দেখার পর যখন সামনের নগরীর দিকে লক্ষ্য করেন, তখন সেটিকে পূর্বাপেক্ষা অধিক জনবহুল ও জনাকীর্ণ দেখতে পান। সঙ্গে সঙ্গে তিনি আল্লাহর কাছে নিজের দাসত্ব প্রকাশ করে স্বীকার করেন যে, নিঃসন্দেহের তোমার কুদরতে কামেলার পক্ষে এগুলো অত্যন্ত সহজ কাজ। ইলমুল ইয়াকিনের পর আজ আমার আইনুল ইয়াকিনও অর্জিত হয়ে গেলো। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে—

أَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلَىٰ قَرْيَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا قَالَ أَنَّىٰ يُحْيِي هَٰذِهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِائَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ قَالَ كَمْ لَبِثْتَ قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالَ بَلْ لَبِثْتَ مِائَةَ عَامٍ فَانْظُرْ إِلَىٰ طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهْ وَانْظُرْ إِلَىٰ حِمَارِكَ وَلِنَجْعَلَكَ آيَةً لِلنَّاسِ وَانْظُرْ إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنْشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمًا فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ()

'অথবা তুমি কি সেই ব্যক্তিকে দেখো নি, যে এমন এক নগরে উপনীত হয়েছিলো যা ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছিলো। সে বললো, মৃত্যুর পর

কীরূপে আল্লাহ একে জীবিত করবেন? তৎপর আল্লাহ তাকে একশো বছর মৃত রাখলেন। পরে তাকে পুনর্জীবিত করলেন। আল্লাহ বললেন, তুমি কত কাল অবস্থান করলে? সে বললো, এক দিন অথবা এক দিনেরও কিছু কম অবস্থান করেছি। তিনি বললেন, না, বরং তুমি একশো বছর অবস্থান করেছো। তোমার খাদ্রসামগ্রী ও পানীয় বস্তুর প্রতি লক্ষ করো, তা অবিকৃত রয়েছে। আর তোমার গর্দভটির প্রতি লক্ষ করো, কারণ তোমাকে মানবজাতির জন্য নিদর্শন স্বরূপ করবো। আর অস্থিগুলির প্রতি লক্ষ করো, কিভাবে সেগুলোকে সংযোজিত করি এবং গোশত দ্বারা ঢেকে দিই। যখন তা তার নিকট স্পষ্ট হলো তখন সে বলে উঠলো, আমি জানি যে, আল্লাহ নিশ্চয়ই সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান।' [সুরা বাকারা : আয়াত ২৫৯]

উল্লিখিত আয়াতসমূহের তাফসিরকালে একটি প্রশ্ন সৃষ্টি হয়। ওই লোকটি কে যার সঙ্গে ঘটনাটি ঘটেছিলো? তার সবচেয়ে প্রসিদ্ধ উত্তর হলো, তিনি হলেন, হযরত উযায়ের আ.। আল্লাহ তাআলা তাঁকে আদেশ করেছিলেন, তুমি জেরুজালেম যাও। আমি স্থানটি দ্বিতীয়বার আবাদ করবো। তিনি সেখানে পৌঁছে দেখতে পেলেন, ধ্বংসস্তূপে পরিণত একটি নগরী মৃত পড়ে আছে। তখন মানবিক অনুভূতির প্রেক্ষিতে তিনি বলে ওঠলেন, এই মৃত বসতি দ্বিতীয়বার কীকরে জীবন পাবে? তিনি মনের ভেতর সংশয় নিয়ে এই মন্তব্য করেন নি, বরং চরম বিস্মিত ও হয়রান হয়ে প্রাণের এমন উপকরণ খুঁজছিলেন যার মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা তাঁর অঙ্গীকার পূরণ করবেন। কিন্তু নিজ নির্বাচিত ও সুচয়িত বান্দা ও নবীর এমন কথা মহান আল্লাহর মনঃপূত হয় নি। কেননা, আল্লাহ যখন দ্বিতীয়বার নগরীটিকে আবাদ করার ওয়াদা করেছেন; এতটুকু সংবাদই তাঁর পক্ষে যথেষ্ট মনে করার দরকার ছিলো। যার প্রেক্ষিতে তাঁর সঙ্গে সেই ঘটনা ঘটে যার বিবরণ পূর্বের আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে। এরপর যখন শত বছরের মৃত জীবন কাটিয়ে তিনি পুনর্জীবন লাভ করেন, ততক্ষণে জেরুজালেম (বাইতুল মুকাদ্দাস) প্রাণচঞ্চল হয়ে উঠেছে।

হযরত আলি, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে সালাম রা., কাতাদাহ, সুলাইমান, হাসান রহ. প্রমুখের অভিমত হলো, উল্লিখিত ঘটনা হযরত উযায়ের আ.-এর সঙ্গেই ঘটেছে।[৪]

---

[৪]. তাফসিরে ইবনে কাসির : ১/৩১ ও তারিখে ইবনে কাসির : ২/৪৩

ওয়াহাব ইবনে মুনাব্বিহ, আবদুল্লাহ ইবনে উবায়দ এবং এক বর্ণনা অনুসারে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে সালাম রা.-এর অভিমত হলো, তিনি হলেন হযরত আরমিয়াহ আ.। ইবনে জারির রহ. এ অভিমতটিকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। আমাদের মতেও এটিই প্রণিধান পাবে।[৫]

ইতিহাস কী বলে?

কারণ হলো, যখন পবিত্র কুরআন সেই ব্যক্তির নাম উল্লেখ করেনি এবং নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে এ সম্পর্কে কোনো সহিহ হাদিসও বর্ণিত নেই, সাহাবায়ে কেরাম ও তাবেঈন থেকে যেসব বাণী বর্ণিত রয়েছে, সেগুলোর উৎসও হলো ওই সকল রেওয়ায়েত, যা ওয়াহাব বিন মুনাব্বিহ, কা'ব আহবার ও হযরত আবদুল্লাহ বিন সালাম রা. প্রমুখ থেকে প্রাপ্ত; যেগুলো তাঁরা নকল করেছেন ইসরাইলি সাহিত্য থেকে তখন উল্লিখিত ঘটনা সম্পর্কিত ব্যক্তিকে খুঁজে বের করার একটাই পথ বাকি থেকে যায়। তা হলো, আমাদেরকে তাওরাতসহ অন্যান্য ঐতিহাসিক উৎসের আলোকে এর সমাধান বের করতে হবে। উল্লিখিত বাস্তবতার পরিপ্রেক্ষিতে যখন আমরা তাওরাতের সবগুলো সহিফা ও ঐতিহাসিক বিবরণসমূহের ওপর গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করি, তখন নিম্নের বৃত্তান্ত আমাদের সামনে এসে পড়ে :[৬]

বনি ইসরাইলের অবাধ্যতা ও অনৈতিকতা যখন সীমা ছাড়িয়ে যায়, অত্যাচার ও পাপাচারের হাট জমে ওঠে তখন আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে ওই সময়ের নবী হযরত ইয়ারমিয়াহ আ.-এর ওপর ওহি আসে যে, আপনি বনি ইসরাইলে ঘোষণা করে দিন, তোমরা তোমাদের এই বদকাজ ছেড়ে দাও, নয়তো বিগত জাতিসমূহের মতো তোমাদেরকেও ধ্বংস করা হবে। হযরত ইয়ারমিয়াহ আ. যখন আল্লাহর ওই বার্তা বনি ইসরাইলের কাছে পেশ করেন, তখন তারা এতে কর্ণপাতই করলো না। তাদের পাপাচারের মাত্রা যেনো পূর্বাপেক্ষা আরো বৃদ্ধি পেলো। তারা আল্লাহর এই মহান নবীর সঙ্গে কৌতুক শুরু করে দিলো এবং এক পর্যায়ে তাঁকে কারাগারে বন্দি করলো। এমতবস্থায়ও হযরত ইয়ারমিয়াহ আ. তাদের জানালেন, তোমরা

---

[৫]. তাফসিরে ইবনে কাসির : ১/৩১ ও তারিখে ইবনে কাসির : ২/৪৪

[৬]. তারিখে ইবনে কাসির : ২/৪২-৪৬

বাবেলের রাজার হাতে ধ্বংস হবে। সে তোমাদের গলায় বেড়ি পড়িয়ে তোমাদেরকে বাবেলে নিয়ে যাবে। সে জেরুজালেমকে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দেবে।[৭]

তখন আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব সপ্তম শতাব্দীর মধ্যবর্তী সময় চলছে। বাবেলে বনু কাদানযার (বুখতেনাস্‌সার) আত্মপ্রকাশ করেছে। সে তার প্রবল রাজপ্রতাপ ও শক্তি ব্যবহার করে ইতোমধ্যে আশপাশের সবগুলো রাজত্বকে ধূলিসাৎ করে ফেলেছিলো। এর অল্প কয়েক দিনের মধ্যে সে ফিলিস্তিনের ওপর উপর্যুপরি তিনবার আক্রমণ করে বনি ইসরাইলকে পরাজিত করে জেরুজালেম ও ফিলিস্তিনের সমস্ত এলাকা ধ্বংসস্তূপে পরিণত করে ফেলে। সমস্ত বনি ইসরাইলিকে বন্দি করে পশুপালের মতো হাঁকিয়ে বাবেলে নিয়ে যায়। তাওরাতের সবগুলো কপিকে ধ্বংস করে ফেলে। এ সময় বনি ইসরাইলির কাছে একটি কপিও অবশিষ্ট ছিলো না। যখন বুখতেনাস্‌সার ইসরাইলিদেরকে গোলাম বানাচ্ছিলো তখন জনৈক ব্যক্তি তাকে বললো, এদের কারাগারে ইয়ারমিয়াহ নামের জনৈক বন্দি রয়েছে। সে আপনার আক্রমণের পূর্বে এসব কিছু ঘটবে বলে বনি ইসরাইলকে অনেক আগেই ভীতি প্রদর্শন করেছিলো। কিন্তু তার জাতি তার কথায় কান না দিয়ে তাকে অন্ধকার কারাগারে নিক্ষেপ করেছে। বুখতেনাস্‌সার এ কথা শোনার পর হযরত ইয়ারমিয়াহ আ.-কে কারাগার থেকে বের করে নিয়ে এলো এবং তাঁর সঙ্গে অনেকক্ষণ কথাবার্তা বললো। সে তখন তাঁর জ্ঞান ও প্রজ্ঞাপূর্ণ আলাপন শুনে অনুরোধ করলো, আপনি আমাদের সঙ্গে বাবেল চলুন, আমরা সেখানে আপনাকে শ্রদ্ধার সঙ্গে রাখবো। হযরত ইয়ারমিয়াহ বললেন, আমার স্বজাতি যখন এতটা অপমানের সঙ্গে বাবেল যাচ্ছে, তাদের বিপরীতে আমি এই শ্রদ্ধার জীবন গ্রহণ করতে পারি না। আমাকে আমার বর্তমান অবস্থার ওপর ছেড়ে দিন।[৮] তখন তিনি জেরুজালেম থেকে অনেক দূরের একটি নির্জন জঙ্গলের একাকিত্বের জীবন বরণ করে নেন। ইয়ারমিয়াহ নবীর পুস্তিকায় রয়েছে, সেখানে বসেই তিনি বাবেলের ইসরাইলিদের কাছে এই ভবিষ্যদ্বাণী লিখিত আকারে প্রেরণ করেন যে, এই

---

৭. ইয়ারমিয়াহ নবির পুস্তিকা

৮. আল বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ : ৩৮-৩৯; তারিখে ইবনে খলদুন, ইনসাইক্লোপিডিয়া

লাঞ্ছনা ও অপদস্থতার সঙ্গে বনি ইসরাইলি বাবেল নগরীতে ৭০ বছর দাসত্ব করবে। এরপর তারা পুনরায় নিজের মাতৃভূমিতে এসে বাস করবে।[৯]

বুখতেনাস্সার মৃত্যুমুখে পতিত হওয়ার অনেক দিন পর যখন আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব ৫৩৯ সনে পারস্যের সম্রাট সাইরাস দ্য গ্রেট [কায়খসরু/খোরাস] বাবেলের রাজা বেলশাযার-কে পরাজিত করে পারস্যকে তার বর্ণনাতীত অত্যাচার থেকে মুক্তি দান করেন। সেসময় তিনি ইসরাইলিদেরকেও আযাদ করে দেন। তাদেরকে নতুন করে জেরুজালেম ও উপসনাগৃহ নির্মাণ করার অনুমতি প্রদান করেন।

সাইরাস বাবেল জয় করার পর প্রায় দশ বছর জীবিত থাকেন। এ সময় বনি ইসরাইলিরা আযাদ হয়ে বাইতুল মুকাদ্দাস নির্মাণে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। কিন্তু যেমনটি আযরার পুস্তিকা থেকে জানা যায়, সাইরাসের জীবদ্দশায় সেই নির্মাণ কাজ তারা শেষ করতে পারে নি। এসময় কতিপয় কর্মকর্তা তাদের ওপর এমন নিপীড়ন করে যে, যার কারণে দুই বার ইসরাইলিদেরকে তার নির্মাণকাজ কিছু দিনের জন্য স্থগিত রাখতে হয়েছিলো। সাইরাসের পর দারা, দারার পর ইরদুশিরের যুগে তারা সেই নির্মাণকাজ পূর্ণ করতে সমর্থ হয়।[১০] ফলে জেরুজালেম তথা বাইতুল মুকাদ্দাস তার হারানো সৌন্দর্য পূর্বের চেয়ে কয়েক গুণ বর্ধিত আকারে ফিরে পায়।

উল্লিখিত আলোচনার সারাংশ হলো, বুখতেনাস্সার কর্তৃক জেরুজালেম ধ্বংস করা এবং সাইরাস থেকে শুরু করে ইরদুশিরের যুগ পর্যন্ত দ্বিতীয়বার সেটির পূর্ণরূপে আবাদ হওয়ার মাঝখানে যে দীর্ঘ মেয়াদ অতিক্রান্ত হয়েছে এটাই সেই বিরতি যাতে ইয়ারমিয়াহ আ.-এর সঙ্গে সেই ঘটনা ঘটেছিলো। যার বিবরণ সূরা বাকারায় উল্লেখ করা হয়েছে।

আলামত ও অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছে, যখন ইয়ারমিয়াহ আ. বুখতেনাস্সারের সঙ্গে বাবেল যেতে অস্বীকৃতি জানিয়েছিলেন এবং বাইতুল মুকাদ্দাসের ধ্বংসযজ্ঞ দেখে ঘাবড়ে গিয়ে দূরবর্তী জঙ্গলের নির্জন জীবন বরণ করেছিলেন তখন মহান আল্লাহ তাঁকে ওহির মাধ্যমে নির্দেশ করলেন, আপনি সেই ধ্বংসস্তূপে ফিরে গিয়ে বাস করতে শুরু করুন। আজ যদিও সেটি বনি ইসরাইলিদের অপকর্মের কারণে ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে; কিন্তু

---

৯. ইয়ারমিয়াহ পুস্তিকা, অধ্যায় : ৯, আয়াত : ১০

১০. আযরা, অধ্যায় : ৭, আয়াত : ১১

সর্বযুগেই এটি নবীদের পদভারে মুখরিত ছিলো। এটিকে আমি দ্বিতীয়বার আবাদ করবো। হযরত ইয়ারমিয়াহ আ. যখন আল্লাহর নির্দেশে সেখানে পৌঁছেন এবং দৃষ্টির সম্মুখে সেখানকার ধ্বংসস্তূপের প্রাণহীন চিত্র ভেসে ওঠে তখন প্রচণ্ড আফসোস, বিস্ময়, আশ্চর্য ও ভাবনা সহকারে তাঁর মনের ভেতর অথবা মুখের ওপর এ কথা চলে আসে যে, এখন এমন কী জীবনস্পন্দন সৃষ্টি হবে, যার মাধ্যমে মহান আল্লাহ এই মৃত জনবসতিকে দ্বিতীয়বার জীবন দান করবেন? তখন সেই ঘটনাগুলো একে একে ঘটতে থাকে, যার বিবরণ কুরআনে এসেছে। এখানে এ কথা বলা নিশ্চয়ই অত্যুক্তি হবে না যে, উল্লিখিত ঘটনায় মহান আল্লাহর প্রজ্ঞা ও কর্মনিপুণতা কাজ করেছে। তা হলো, যেহেতু মহান আল্লাহ সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে, সহসা জেরুজালেম আবাদ হবে না। সেখানে জীবনের চাঞ্চল্য ফিরে আসতে প্রচুর সময় লাগবে। এখন যদি হযরত ইয়ারমিয়াহ আ. তাঁর স্বজাতি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে এই বিরানভূমিতে নিঃসঙ্গ পড়ে থাকেন, তাহলে তা হবে তার জন্য অসহনীয় কষ্ট। যে কারণে মহান আল্লাহর রহমত তাঁর সেই বিস্ময়সূচক প্রশ্নকে বাহানা বানিয়ে সেই দীর্ঘ সময়ের জন্য তাঁকে মৃত্যুর কোলে ঘুম পাড়িয়ে দেয়। এরপর তাকে ঠিক তখন জাগিয়ে দেয়, যখন জেরুজালেম পূর্বের মতো প্রাণচাঞ্চল্যে উচ্ছল কর্মমুখর জীবন ফিরে পায়।

হযরত ইয়ারমিয়াহ আ. সম্ভবত দেড়শো বছর হায়াত পেয়েছিলেন। তাতে ঘটনাবহুল অনেক সময়ও রয়েছে। সেই যুগের স্বাভাবিক বয়সের বিচারে এই দীর্ঘ জীবন আশ্চর্যের কিছু নয়।

উল্লিখিত অভিমতের সমর্থন পাওয়া যায় হযরত য়াসইয়াহ আ.-এর একটি ভবিষ্যদ্বাণী থেকে, যা তিনি দেড়শো বছর পূর্বে বনি ইসরাইলিদের মুক্তিদাতা সাইরাস সম্পর্কে ব্যক্ত করেছিলেন।[১১] কারণ হলো, য়াসইয়াহ নবীর ইন্তিকালের অব্যবহিত পরে হযরত ইয়ারমিয়াহ নবী আবির্ভূত হন। কাজেই বনি ইসরাইলিদের মুক্তির মধ্যবর্তী সময়ের ব্যাপারটি তার সঙ্গেই ঘটার সম্ভাবনা রাখে। এর বিপরীতে হযরত উযায়ের আ.-এর পবিত্র জীবন সম্পর্কে যে বিবরণ তাওরাতসহ অন্যান্য ইসরাইলি বর্ণনায় পাওয়া যায় সেগুলো থেকে জানা যায় যে, বাবেলের বন্দিত্বের সময় তিনি ছোট ছিলেন। এ সময় তিনি ইসরাইলিদের সঙ্গে বাবেলেই থেকেছেন। চল্লিশ বছর বয়সে

[১১]. অধ্যায় : ৪, আয়াত : ২৮

তিনি 'ফকিহ' স্বীকৃতি পেয়ে যান। সেখানেই তিনি নবুয়ত লাভ করেন। যারা জেরুজালেমের পুনর্নির্মাণকাজে বিঘ্ন ঘটাচ্ছিলো, তাদের বিরুদ্ধে তাঁর নেতৃত্বেই বনি ইসরাইলের প্রতিনিধিদল দারা ও ইরদুশিরের রাজদরবারে চেষ্টা চালিয়েছিলো। তাওরাত ধ্বংস হওয়ার পর জেরুজালেমে তাওরাতের যে নতুন সংস্করণ রচিত হয়েছিলো, তা ছিলো সেই হযরত উযায়ের আ.-এর নবুওতের ফসল।

মোটকথা, বনি ইসরাইলিদের বাবেলের বন্দিদশা থেকে শুরু করে মুক্তিলাভ এবং বাইতুল মুকাদ্দাস পুনর্নির্মাণ ও জেরুজালেম আবাদকরণ পর্যন্ত এই বিশাল সময়কালে হযরত উযায়ের আ.-কে বনি ইসরাইলিদের সঙ্গে দেখা যাচ্ছে।

এগুলোই হচ্ছে সেই সাক্ষ্য ও আলামত, যার ওপর ভিত্তি করে মুফাসসিরগণের প্রবল মতকে আমরা দুর্বল এবং তাদের দুর্বল মন্তব্য করা মতটিকে প্রবল ও প্রণিধানযোগ্য বলার সাহস পাচ্ছি। তবে প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে মহান আল্লাহই ভালো জানেন।

উল্লিখিত আয়াতসমূহে কে উদ্দেশ্য, সে সম্পর্কে আমরা দুটি অভিমত উল্লেখ করলাম। এগুলোর বাইরে আরো কিছু অভিমত রয়েছে। যেমন, হযরত হিযকিল আ. অথবা বনি ইসরাইলের কোনো এক অজ্ঞাত ব্যক্তি।[১২]

ঘটনার ভুল ব্যাখ্যা

সুরা কাহাফের তাফসিরি ফায়দাসমূহ লেখার সময় মাওলানা আযাদ এক স্থানে সুরা বাকারার উল্লিখিত ঘটনাকে হযরত হিযকিল আ.-এর কাশফ অভিহিত করেছেন। যা হিযকিল নবীর পুস্তিকার সঙ্গে প্রায় মিলে যায়।[১৩]

তার কথাগুলো চরম বিস্ময় সৃষ্টি করছে। হয়রান না হয়ে পারা যায় না। যখন পবিত্র কুরআন উল্লিখিত ঘটনাটিকে পরিষ্কার ও স্পষ্ট ভাষায় জনৈক ব্যক্তির ঘটনা বলে উল্লেখ করে বলেছে যে, মহান আল্লাহ তাকে একটি নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য মৃত্যুর কোলে ঘুম পাড়িয়ে দিলেন, এরপর তাকে পুনর্জীবন দান করে সেই মৃত্যুর মেয়াদকাল সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন, আর তিনি তার সঠিক উত্তর দিতে সমর্থ হলেন না, তখন নিজেই তার সঠিক

---

[১২]. তাফসিরে ইবনে কাসির : ১/৩১৪

[১৩]. তাফসিরে তরজমানুল কুরআন, খণ্ড : ২

উত্তর জানিয়ে দিলেন এবং তৎসংশ্লিষ্ট সকল সাক্ষ্য প্রত্যক্ষ করিয়ে দিলেন। তাহলে কিভাবে মাওলানা আযাদ হযরত হিযকিল আ.-এর কাশফকে এই ঘটনার তাফসির বা ব্যাখ্যা বলে চালিয়ে দিচ্ছেন?

أَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلَىٰ قَرْيَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا قَالَ أَنَّىٰ يُحْيِي هَٰذِهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِائَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ قَالَ كَمْ لَبِثْتَ قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالَ بَلْ لَبِثْتَ مِائَةَ عَامٍ فَانْظُرْ إِلَىٰ طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهْ وَانْظُرْ إِلَىٰ حِمَارِكَ وَلِنَجْعَلَكَ آيَةً لِلنَّاسِ وَانْظُرْ إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنْشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمًا فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

লক্ষ করুন, একজন সম্মানিত ব্যক্তি এমন এক ধ্বংসস্তূপ ও অনাবাদ জনবসতি পার হচ্ছেন যা একসময় জীবনচাঞ্চল্যে উদ্দীপ্ত জনপদ ছিলো। যেখানে লাখো নাগরিক বাস করতো। أَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلَىٰ قَرْيَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا তিনি জনবসতির চিত্র দেখলেন আর মনে মনে ভাবলেন কিংবা মুখে বলে ফেললেন, কীকরে এই মৃত জনবসতি পুনর্জীবন পাবে? قَالَ أَنَّىٰ يُحْيِي هَٰذِهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا তখন আল্লাহ তাআলা ওই স্থানে তার রূহ কবয করলেন এবং একশো বছর পর্যন্ত ওই অবস্থায় রেখে দিয়ে দ্বিতীয়বার জীবিত করলেন। فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِائَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ জীবন দান করার পর সেই ব্যক্তিকে জিজ্ঞেস করলেন, বলো তো, তুমি এখানে কত দিন পড়ে ছিলে? সম্মানিত লোকটি উত্তর করলেন, এক দিন বা দিনের কিয়দাংশ। قَالَ كَمْ لَبِثْتَ قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ যেহেতু উত্তরটি ভুল ছিলো, এ কারণে আল্লাহ তাআলা সংশোধন করে অবস্থার প্রকৃত চিত্র তুলে ধরে বলেন, না, বরং তুমি একশো বছর পর্যন্ত মৃত্যুর কোলে ঘুমিয়ে ছিলে। قَالَ بَلْ لَبِثْتَ مِائَةَ عَامٍ এরপর তিনি তাঁর শক্তিময় কুদরতের চিত্র প্রত্যক্ষ করিয়ে দিলেন যে, একদিকে এই দীর্ঘ সময় অতিক্রান্ত হওয়া সত্ত্বেও খাদ্যসামগ্রীর সব কিছু টাটকা ও সতেজ রয়েছে। মৌসুমের পালাবদল তাতে কোনো আঁচড় ফেলতে পারে নি। অন্যদিকে তার বাহন গাদাটির গোটা দেহ পচে-গলে নিঃশেষ হয়ে গুটিকয়েক হাড্ডির একটি কাঠামো পড়ে আছে। فَانْظُرْ إِلَىٰ طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهْ এরপর বললেন, আমি এতসব কাজ করেছি এ

উদ্দেশ্যে যে, তোমাকে আমি পৃথিবীর মানুষদের কাছে আমার কুদরতে কামেলার একটি 'নিদর্শন' বানাতে চাই। وَلِنَجْعَلَكَ آيَةً لِلنَّاسِ উল্লিখিত আলাপনের পর সেই সম্মানিত ব্যক্তিকে দেখিয়ে দেন যে, কীভাবে হাড্ডিগুলো পরস্পরে সংযুক্ত হলো, কী করে তার ওপর গোশতের প্রলেপ পড়লো, কীভাবে তা চামড়ার আবরণে ঢাকা পড়লো। এরপর গাধাটি জীবিত হয়ে দাঁড়িয়ে গেলো। وَانْظُرْ إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنْشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمًا এগুলো দেখে স্বচক্ষে পর্যবেক্ষণ করার পর যখন সেই মহান সম্মানিত ব্যক্তি ইলমুল ইয়াকিন [দৃঢ়বিশ্বাসমূলক জ্ঞান] থেকে আইনুল ইয়াকিন [দিব্যজ্ঞান]-এ উন্নীত হলেন, তখন তিনি অকপটে স্বীকার করলেন, নিঃসন্দেহে মহান আল্লাহর কুদরতে কামেলার জন্য এসব জীবনোপকরণ ও কার্যকারণের প্রয়োজন নেই। তিনি যেভাবে ইচ্ছে কোনো বিঘ্ন ছাড়াই করে ফেলার সক্ষমতা রাখেন। তাঁর কাজে কেউ বাধা সৃষ্টি করতে পারে না। ইরশাদ হয়েছে—

فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

'যখন তা তার নিকট স্পষ্ট হলো তখন সে বলে উঠলো, আমি জানি যে, আল্লাহ নিশ্চয়ই সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান।'

এই পরিষ্কার ও স্বচ্ছ অর্থবিশিষ্ট আয়াতসমূহের ওপর দ্বিতীয়বার লক্ষ্য করুন আর ভাবুন, পবিত্র কুরআন উল্লিখিত ঘটনাকে একটি বাস্তব ঘটনার আকার দিয়ে বর্ণনা করেছে না-কি রূপক অর্থে একটি 'কাশফ' আকারে পেশ করেছে? তাহলে বলুন, হযরত হিযকিল আ.-এর কাশফ আর উল্লিখিত আয়াতসমূহে উল্লিখিত ঘটনার মাঝখানে সাযুজ্য থাকার কারণে দুটিকে এক ও অভিন্ন বলা কীকরে সহিহ হতে পারে? না, কখনই তা সহিহ হতে পারে না। নিঃসন্দেহে মাওলানা আযাদের উল্লিখিত ব্যাখ্যা বাতিল।

তবে এ কথা বলা সহিহ হতে পারে যে, যদি হযরত ইয়ারমিয়াহ আ.-এর জীবনে উল্লিখিত ঘটনা ঘটে থাকে তাহলে তার কাছাকাছি একটি ঘটনা হযরত হিযকিল আ.-এরও কাশফ হতে পারে। যেটি তাওরাতের হিযকিল নবীর পুস্তিকায় উল্লেখ করা হয়েছে। যে কাশফে তিনি বনি ইসরাইলের শুকিয়ে যাওয়া হাড্ডিকে দ্বিতীয়বার জীবিত হতে দেখেছিলেন। মহান আল্লাহ তখন তাকে জানান, এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, বনি ইসরাইলিরা এখন

নিরাশ হয়ে আছে যে, ওই ধ্বংসযজ্ঞের পর আমরা কখনো জেরুজালেমে দ্বিতীয়বার আবাদ হতে পারবো না। আমি তোমার মাধ্যমে ওদেরকে খবরদার করতে চাইছি যে, আল্লাহর ফয়সালা হলো, অবশ্যই তা ঘটবে।[১৪]

আল্লাহর পুত্র বিশ্বাস করা

ইতোপূর্বে আমরা আলোচনা করেছি যে, যখন বুখতেনাস্‌সার বাইতুল মুকাদ্দাস ধ্বংস করে ফেলে এবং বনি ইসরাইলের পুরুষ, মহিলা ও শিশুদেরকে ভেড়ার পালের মতো হাকিয়ে নিয়ে চলে যায়, তখন সে তাওরাতের সবগুলো অনুলিপিকেও মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দিয়েছিলো। এ সময় বনি ইসরাইলিদের কাছে যেভাবে তাওরাতের কোনো অনুলিপি ছিলো না, তেমনি আদ্যোপান্ত তাওরাত মুখস্থকারী কোনো হাফেযও ছিলো না। যার কারণে তারা যখন বাবেলে বন্দি ছিলো, তখন তারা তাওরাত থেকে সম্পূর্ণ বঞ্চিত ছিলো। দীর্ঘদিন পর যখন তারা বন্দিদশা থেকে মুক্তি পায় এবং বাইতুল মুকাদ্দাসে এসে দ্বিতীয়বার থিতু হয় তখন তাদেরকে এ চিন্তা পেয়ে বসে যে, এখন তাওরাত কীভাবে পাওয়া যাবে? তখন হযরত উযায়ের আ. সকল ইসরাইলিকে একত্র করে তাদের সামনে আদ্যোপান্ত তাওরাত পাঠ করেন এবং লিখিয়ে দেন।

কিছু ইসরাইলি বর্ণনায় পাওয়া যায়, যেসময় তিনি ইসরাইলিদের একত্র করেন তখন সবার উপস্থিতিতে আকাশ থেকে দুটি উজ্জ্বল নক্ষত্র নেমে আসে এবং হযরত উযায়ের আ.-এর বুকের ভেতর প্রবিষ্ট হয়। তখন হযরত উযায়ের বনি ইসরাইলকে নতুন করে আদ্যোপান্ত তাওরাত সংকলন করে প্রদান করেন। যখন তিনি এই অতি গুরুত্বপূর্ণ কাজ শেষ করেন তখন ইসরাইলিরা প্রচণ্ড উল্লাস প্রকাশ করেছিলো। তাদের মনে তখন হযরত উযায়ের আ.-এর সম্মান ও মর্যাদা পূর্বাপেক্ষা কয়েক গুণ বেড়ে যায়।[১৫] তাদের সেই ভালোবাসা ধীরে ধীরে এতটাই গোমরাহির আকার ধারণ করে যে, খ্রিস্টানরা যেভাবে হযরত ঈসা আ.-কে আল্লাহর ছেলে স্বীকার করে থাকে, অনুরূপ তারাও হযরত উযায়ের আ.-কে আল্লাহর ছেলে দাবি করতে শুরু করে। বনি ইসরাইলের একটি গোষ্ঠী তাদের সেই

---

[১৪]. হিযকিল, অধ্যায় : ৩৭, আয়াত : ১-১৪

[১৫]. আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া : ২/৪৫

বিশ্বাসের পেছনে এ দলিল দিয়েছে যে, মুসা আ. যখন আমাদেরকে তাওরাত এনে দেন তখন সেটি একটি কাষ্ঠফলকে লেখা ছিলো। কিন্তু উযায়ের আ. কোনো ধরনের কাষ্ঠফলক বা তক্তা বা লিখিত কাগজ ছাড়াই প্রতিটি অক্ষর তার বক্ষের ভেতরের কাষ্ঠফলক থেকে আমাদের সামনে নকল করে দিয়েছেন। তিনি আল্লাহর বৎস ছিলেন; বলেই এটি করতে পেরেছেন।[১৬] নাউযুবিল্লাহ। মহান আল্লাহ এর থেকে পবিত্র। এটি মিথ্যাচার ছাড়া আর কিছুই নয়।

একটি সংশয়ের উত্তর

ইহুদিরা হযরত উযায়েরকে আল্লাহর বৎস দাবি করে, পবিত্র কুরআনের উল্লিখিত ঘোষণার ওপর বর্তমান সময়ের কতিপয় ইহুদি আলেম আপত্তি পেশ করে। তারা বলে, আমরা তো উযায়েরকে আল্লাহর বৎস মানি না। কাজেই কুরআনের এই ঘোষণা ভুল। আসল কথা হলো, সত্যকে গোপন করা ও মিথ্যার চাদরে নিজেকে আবৃত করে উপস্থাপন করা ইহুদিদের চিরকালীন অভ্যাস। বর্তমানের ইহুদি পণ্ডিতরাও এর ব্যত্যয় ঘটায় নি। তাদের উল্লিখিত আপত্তিও সেই সত্যকে গোপন করার ভিত্তিমূলের ওপর প্রতিষ্ঠিত। যেসব লোক পৃথিবীর প্রচলিত ধর্মসমূহের ওপর গবেষণা করেছেন, যারা বিভিন্ন ইসলামি দেশ ভ্রমণ করেছেন এবং যাদের পড়াশুনা রয়েছে; তাদের প্রত্যেকেই জানেন যে, আজও ফিলিস্তিনের বিভিন্ন অঞ্চলে ইহুদিদের সেই উপদলের অস্তিত্ব বিদ্যমান রয়েছে, যারা হযরত উযায়েরকে আল্লাহর ছেলে বিশ্বাস করে থাকে। তারা রোমান ক্যাথলিক খ্রিস্টানদের মতো তার মূর্তি বানিয়ে তাকে ঈশ্বরের মতো পূজা দিয়ে থাকে।

হযরত উযায়ের আলাইহিস সালাম-এর জীবনী

সিরাত ও ইতিহাসের গ্রন্থাবলিতে হযরত উযায়ের আ.-এর পবিত্র জীবনী সম্পর্কে বিশদ তথ্য পাওয়া যায় না। এমনকি তাওরাতসমষ্টির আযরা পুস্তিকায়ও খোদ তার জীবনীর ওপর বিশদাকারে আলোকপাত করা হয় নি। পুস্তিকাটির সিংহভাগ আলোচনা বাবেলের বন্দিদশা ও তৎসংশ্লিষ্ট বিবরণ সম্বলিত। অবশ্য তাওরাত, ওয়াহাব ইবনে মুনাব্বিহ ও কা'ব

---

১৬. প্রাগুক্ত : ২/৪৬

আহবার থেকে বর্ণিত রেওয়ায়েতসমূহ থেকে শুধু এতটুকু জানা যায় যে, তিনি বুখতেনাস্‌সারের বাইতুল মুকাদ্দাস আক্রমণের সময় কমবয়স্ক ছিলেন। চল্লিশ[১৭] বছর বয়সে বনি ইসরাইলের 'ফকিহ' পদে সমাসীন হন। এরপর তাঁকে নবুয়ত প্রদান করা হয়। তিনি এবং নবী নজমিয়াহ আ. বনি ইসরাইলের হেদায়েত প্রদানের দায়িত্ব পালন করতেন। ইরদুশিরের শাসনামলে তিনি বাইতুল মুকাদ্দাসের নির্মাণ নিয়ে বনি ইসরাইলের বিভিন্ন সমস্যা দূর করার মিশন নিয়ে রাজদরবারে নিজস্ব প্রভাব-প্রতিপত্তি কাজে লাগান।[১৮]

প্রসিদ্ধ বর্ণনা অনুসারে যেসকল বুযুর্গ সুরা বাকারার ঘটনাটি তাঁর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মর্মে অভিমত পেশ করেছেন, তারা এ প্রসঙ্গে কিছু অতিরিক্ত বিবরণ হযরত আবদুল্লাহ বিন সালাম ও কা'ব আহবার প্রমুখ থেকে নকল করেছেন। ইবনে কাসির রহ. তাঁর ইতিহাসগ্রন্থে সেগুলো উল্লেখ করেছেন। মুফাসসিরদের মধ্য হতে কেউ কেউ আলোচিত আয়াতের তাফসিরের অধীন সেগুলোকে নকল করেছেন।

হযরত সুলাইমান আ.-এর ঘটনাবলির অধীনে একটি সহিহ রেওয়ায়েত নকল করা হয় যে, একবার জনৈক নবীকে একটি পিপীলিকা দংশন করে। তিনি রাগান্বিত হয়ে পিপীলিকার গর্তে আগুন ঢেলে সমস্ত পিপীলিকা পুড়িয়ে মেরে ফেলেন। তখন মহান আল্লাহ ওহির মাধ্যমে তাঁকে কড়া ভাষায় বলেছিলেন, তুমি একটি পিপীলিকার অপরাধে সমস্ত পিপীলিকাকে জ্বালিয়ে দেওয়া কীভাবে জায়েয মনে করলে? উল্লিখিত ঘটনা সম্পর্কে ইবনে কাসির ইসহাক বিন বশিরের সনদে নকল করেছেন যে, মুজাহিদ, ইবনে আব্বাস ও হাসান বসরি প্রমুখের অভিমত হলো, তিনি ছিলেন হযরত উযায়ের আ.।[১৯]

উযায়ের আ. সম্পর্কে আরো কিছু ঘটনা বর্ণিত রয়েছে। রেওয়ায়েত ও দিরায়াত [বর্ণনামান ও ভাষ্যের মান] উভয় বিচারেই সেগুলো প্রত্যাখ্যাত, বানোয়াট ও গালগল্প। তাইতো ইবনে কাসির প্রমুখ সেগুলো নকল করে প্রত্যাখ্যান করে দিয়েছেন।[২০]

---

[১৭]. আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া ২/৪২

[১৮]. আযরা পুস্তিকা

[১৯]. আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, তারিখে তাবারি

[২০]. আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া : ২/৪৭

নবুয়ত লাভ

এখানে একটি বিষয় স্পষ্ট করা দরকার যে, যেসব রেওয়ায়েতে হযরত উযায়ের আ.-কে উল্লিখিত আয়াতসমূহের উদ্দিষ্ট অভিহিত করা হয়েছে, সেখানে এ কথাও বলা হয়েছে যে, হযরত উযায়ের আ. নবী ছিলেন না; তিনি একজন সৎ লোক ছিলেন। অথচ জমহুর উলামায়ে কেরামের মতে তিনি নবী ছিলেন। পবিত্র কুরআন যেভাবে তাঁর কথা উল্লেখ করেছে, তাতে বুঝা যায় যে, তিনি ছিলেন আল্লাহর নবী। পথহারা ইহুদিরা তাকে এমন ভাবে 'আল্লাহর বৎস' বানিয়েছিলো যেভাবে খ্রিস্টানরা হযরত ঈসা আ.-কে বানিয়েছে। উপরন্তু তাওরাতও তাকে নবী হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে।

এছাড়া যেসকল বুযুর্গ একদিকে সুরা বাকারার আলোচিত আয়াতসমূহের প্রতিপাদ্য হযরত উযায়ের আ.-কে বানিয়েছেন এবং অন্যদিকে তাঁর নবী হওয়াকে অস্বীকার করেছেন, তাদের লক্ষ করা উচিত যে, বাকারার উল্লিখিত আয়াতে মহান আল্লাহ তাঁকে সরাসরি সম্বোধন করেছেন। তাঁর সঙ্গে কথোপকথন করেছেন। যা তাঁর নবী হওয়ার স্পষ্ট প্রমাণ।

মোটকথা, হযরত উযায়ের আ.-এর নবী হওয়া সম্পর্কে দুটি অভিমত রয়েছে। প্রবল অভিমত হলো, তিনি নিঃসন্দেহে আল্লাহর একজন নবী ছিলেন।

বংশপরম্পরা

হযরত উযায়ের আ.-এর পিতার নাম ও তাঁর বংশপরম্পরার কিছু নাম নিয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতভেদ পাওয়া যায়। তবে একথার ওপর সবাই একমত যে, তিনি হযরত হারুন বিন ইমরান আ.-এর বংশধর।

ইবনে আসাকির তাঁর পিতার নাম 'জারওয়াহ' বলেছেন। কেউ বলেছেন, 'সুওয়াইরিক'। কেউ লিখেছেন, 'সারুখা'। আযরা পুস্তিকায় তাঁর নাম 'খলিকাহ' লেখা রয়েছে।

ইন্তিকাল ও কবর

ওয়াহাব বিন মুনাব্বিহ, কা'বে আহবার ও আবদুল্লাহ বিন সালাম রা. থেকে ইবনে কাসির রহ. হযরত উযায়ের আ. সম্পর্কে যে দীর্ঘ বর্ণনা নকল করেছেন সেখানে রয়েছে যে, হযরত উযায়ের আ. বনি ইসরাইলের জন্য তাওরাতের নতুন সংস্করণ ইরাক অন্তর্গত 'দিরে হিযকিল' নগরীতে সংকলন

করেছেন। তারই পার্শ্ববর্তী একটি গ্রাম 'সায়েরাবাদ'-এ তাঁর ইন্তিকাল হয়েছিলো।[২১]

অন্য এক স্থানে তিনি লিখেছেন, কিছু কিছু বাণীতে পাওয়া যায় যে, তাঁর কবর দামেশকে অবস্থিত।[২২]

শিক্ষা ও উপদেশ

হযরত উযায়ের আ.-এর ঘটনাবলিকে নেহায়েত-ই গল্প মনে না করে যারা ঐতিহাসিক বাস্তবতা মনে করেন, নিঃসন্দেহে তারা সেখানে পাবেন অনেক গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা ও নসিহতের খোরাক। নিম্নে তার কয়েকটি পেশ করা হলো–

১। একজন মানুষ উন্নতি করে সর্বোচ্চ শিখরে উন্নীত হতে পারে, সে আল্লাহর খুব কাছে চলে যেতে পারে, কিন্তু তার সর্বশেষ পরিচয় একটাই 'আল্লাহর বান্দা'। সর্বোচ্চ শিখরে উন্নীত হওয়ার অর্থ এ নয় যে, সে আল্লাহর ছেলে হয়ে গেছে। কেননা, আল্লাহ তাআলার সত্তা একক, অদ্বিতীয়। পিতা-পুত্রের বন্ধন থেকে তিনি পবিত্র। তিনি এর অনেক উর্ধ্বে। এখন যদি কোনো সম্মানিত ব্যক্তি থেকে এমন কোনো কাণ্ড ঘটে, যা স্বভাবত মানববুদ্ধির বিচারে বিস্ময়কর মনে হয়, তখন অনেকে নির্বুদ্ধিতার পরিচয় দিয়ে চিৎকার বলে ওঠে, আরে, তিনি তো খোদার অবতার [মানবরূপী খোদা] বা তার বৎস। তারা ভেবে দেখে না যে, এ সকল ঘটনা খোদায়ি শক্তির মাধ্যমে 'নিদর্শন' স্বরূপ তার হাতে প্রকাশ পেয়েছে। এতে তার কোনো নিজস্ব হাত নেই। এর কারণে তিনি খোদা হতে পারেন না, বা তার ছেলেও হাতে পারেন না। বরং তিনি আল্লাহর একজন কাছের বান্দা মাত্র। আল্লাহ তাঁর বিশেষ জরুরি নীতি প্রয়োগ করে তাঁর সততার প্রমাণ হিসেবে, তাঁর সমর্থনে প্রকাশ করেছেন। নয়তো আল্লাহর অন্যান্য বান্দা যেভাবে আল্লাহর সামনে অক্ষম, তিনিও এর ব্যতিক্রম নন। পবিত্র কুরআন বিভিন্ন স্থানে উল্লিখিত বিষয়টিকে স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করেছে। উদ্দেশ্য একটাই। তা হলো, আমাদেরকে উল্লিখিত ভ্রান্ত বিশ্বাস থেকে কঠোরভাবে নিরাপদ রাখা।

---

[২১]. আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া : ২/৪৫

[২২]. আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া : ২/৪৩

২। আল্লাহ তাআলা সুরা বাকারার উল্লিখিত ঘটনাকে হযরত ইবরাহিম আ.-এর একটি ঘটনার সঙ্গে যুক্ত করে পেশ করেছেন। যেখানে রয়েছে যে, তিনিও একবার আল্লাহ তাআলাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, আপনি কীভাবে মৃতদেহে প্রাণ দান করেন তা আমাকে জানান। আল্লাহ তখন জিজ্ঞেস করেছিলেন, ইবরাহিম, তুমি কি বিষয়টি বিশ্বাস করো না? তখন ইবরাহিম আ. জবাবে বলেন, হে আমার খোদা, নিঃসন্দেহে আমি বিশ্বাস করি যে, আপনি মৃতকে জীবন দান করেন। কিন্তু আমি তা জানতে চেয়েছি মনের প্রশান্তি অর্জনের জন্য। আল্লাহ তাআলা সেই ঘটনাটিকে এই ঘটনার সঙ্গে মিলিয়ে এজন্য বয়ান করেছেন, যাতে এ কথা দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট হয়ে যায় যে, আম্বিয়া আলাইহিমুস সালামের পক্ষ থেকে এ ধরনের প্রশ্ন এ কারণে উত্থাপিত হতো না যে, তারা বুঝি 'মৃতকে জীবনদান'-এর ব্যাপারে সংশয় বোধ করতেন এবং এখন তা দূর করতে চাচ্ছেন। বরং তাদের এ প্রশ্ন করার একটাই উদ্দেশ্য হতো। তা হলো, বিষয়টি সম্পর্কে তাদের যে ইলমুল ইয়াকিন [দৃঢ়জ্ঞান] রয়েছে, সেটিকে উন্নত করে আইনুল ইয়াকিন [দিব্যজ্ঞান] ও হক্কুল ইয়াকিন [প্রত্যক্ষ জ্ঞান]-এর স্তরে উন্নীত করা। অর্থাৎ তারা যেভাবে বিষয়টিকে হৃদয় থেকে বিশ্বাস করেন সেভাবে তারা চাচ্ছিলেন, দৃষ্টির মাধ্যমে প্রত্যক্ষ করতে। যাতে আল্লাহ সৃষ্টিজীবকে পথ দেখানোর যে দায়িত্ব তাঁদের ওপর ন্যস্ত রয়েছে, সেটিকে যেনো তাঁরা সর্বোচ্চ পারঙ্গমতার সঙ্গে পালন করতে পারেন এবং বিশ্বাসের এমন কোনো উচ্চ থেকে উচ্চতর স্তর যেনো তাদের অর্জনের বাইরে থেকে না যায়।

৩। দুনিয়া হলো কার্যক্ষেত্র। প্রতিদানের ক্ষেত্র হিসেবে দ্বিতীয় একটি জগৎ রয়েছে। যাকে 'দারুল আখিরাত' বলা হয়ে থাকে। তবে আল্লাহর চিরন্তন নীতি হলো, তাঁর দৃষ্টিতে 'জুলুম' ও 'অহঙ্কার' এমনই বদআমল যে, তিনি জালিম ও অহঙ্কারীকে দুনিয়াতে লাঞ্ছনা, অপমান ও অসম্মানের তিক্ত স্বাদ আস্বাদন করিয়ে দেন। বিশেষকরে, ওই দুটি কর্ম যদি ব্যক্তিবিশেষের স্থলে যদি গোটা সম্প্রদায়ের স্বভাবে জায়গা করে নেয় এবং এটি তাদের চরিত্রের অংশ হয়ে যায়। ইরশাদ হয়েছে—

قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ

'বলো, পৃথিবীতে ভ্রমণ করো এবং দেখো, অপরাধীদের পরিণাম কীরূপ হয়েছে।' [সুরা নামল : আয়াত ৭৯]

তবে এ কথাও মনে রাখতে হবে যে, কোনো জাতির সামাজিক জীবনের টিকে থাকা-না থাকার জীবনকাল এক রকম হয়। আর ব্যক্তির ব্যক্তিগত জীবনের টিকে থাকা-না থাকার জীবনকাল অন্য রকম হয়। যার কারণে দেখা যায় যে, তাদের কর্মের প্রতিফল আসতে দেরি হচ্ছে। এ কারণে কোনো সাহসী ও উচ্চ মর্যাদাবান ব্যক্তির ঘাবড়ে যাওয়া বা নিরাশ হওয়া ঠিক হবে না। কেননা, আল্লাহর তৈরি করা আইন অনুযায়ী 'কর্মের প্রতিদান' তার নির্দিষ্ট সময় থেকে সরতে পারে না।

হযরত যাকারিয়া
আলাইহিস সালাম

কুরআনে হযরত যাকারিয়া আ.-এর আলোচনা

পবিত্র কুরআনে সুরা আলে ইমরান, আনআম, মারইয়াম ও আম্বিয়া, এই চারটি সুরায় হযরত যাকারিয়া আ.-এর আলোচনা এসেছে।

ক্র.	সুরার নাম	আয়াত নং	সংখ্যা
১.	আলে ইমরান	৩৭-৪১	৫
২.	আনআম	৮৫	১
৩.	মারইয়াম	২-১১	১০
৪.	আম্বিয়া	৮৯-৯০	২
			১৮

এই সুরাসমূহের মধ্যে সুরা আনআমে নবীগণের তালিকায় শুধু তাঁর নাম উল্লেখ করা হয়েছে। অবশিষ্ট তিন সুরায় সংক্ষেপে তার সম্পর্কে আলোচনা এসেছে।

বংশপরম্পরা

পবিত্র কুরআনে যে যাকারিয়া আ.-এর কথা আলোচনা করা হয়েছে তিনি সেই যাকারিয়া নন, যার কথা তাওরাতসমষ্টিতে যাকারিয়ার পুস্তিকায় এসেছে। তাওরাতে যে যাকারিয়ার নাম এসেছে তিনি ছিলেন দারয়ুউস (দারা)-এর সমবয়সী। যাকারিয়া নবীর পুস্তিকায় এসেছে—

> 'দারার ক্ষমতারোহণের দ্বিতীয় বছরের অষ্টম মাসে খোদাওয়ান্দের কালাম যাকারিয়া বিন বারখিয়া বিন আদুর হস্তগত হয়।'[২৩]

আর দারা বিন গোশতাসপ-এর সময়কাল হলো হযরত মাসিহ আ.-এর জন্মের পাঁচশো বছর পূর্বে। কেননা, তিনি কায়কোবাদ বিন কায়খসরুর পরলোকগমনের পর খ্রিস্টপূর্ব ৫২১ সনে সিংহাসনে আরোহণ করেন। পক্ষান্তরে কুরআ নুল কারিমে যে যাকারিয়া আ.-এর আলোচনা এসেছে তিনি হযরত মাসিহ আ.-এর জননী হযরত মারইয়াম আলাইহাস সালামের অভিভাবক ও হযরত মাসিহ আ.-এর সমকালীন ছিলেন। তাঁর মাঝখানে

---

[২৩]. অধ্যায় : ১, আয়াত : ১

আর ইয়াহইয়া বিন যাকারিয়া ও মাসিহ আলাইহিমাস সালামের মাঝখানে অন্যকোনো নবীর আগমন ঘটেনি এবং তিনি ছিলেন হযরত ইয়াহইয়া আ.-এর সম্মানিত পিতা।[২৪]

হযরত যাকারিয়া আ.-এর পিতার নাম কী ছিলো? এ নিয়ে সিরাত গবেষকদের নানা অভিমত রয়েছে। এগুলোর মধ্য হতে কোনো অভিমতকেই চূড়ান্ত বলার সুযোগ নেই। হাফেয ইবনে হাজার রহ ফাতহুল বারিতে এবং ইবনে কাসির তাঁর তাফসির ও ইতিহাসে ইবনে আসাকির রহ. থেকে সেই বক্তব্যগুলো উদ্ধৃত করেছেন। অর্থাৎ যাকারিয়া বিন উদন (দান) অথবা বিন শাবায়ি অথবা বিন লাদুন অথবা বিন বারখিয়া বিন মুসলিম[২৫] বিন সদূক বিন জাশান বিন দাউদ বিন সুলাইমান বিন মুসলিম বিন সিদ্দিকাহ বিন বারখিয়া বিনি বালআতাহ বিন নাহুর বিন শালুম বিন বাহফাশাত বিন আইনামান বিন রাজআম বিন সুলাইমান বিন দাউদ আলাইহিমাস সালাম।

তবে এতটুকু তথ্যের ওপর তারা সবাই একমত যে, তিনি হযরত সুলাইমান বিন দাউদ আলাইহিমাস সালামের বংশধর ছিলেন।[২৬]

জীবনবৃত্তান্ত

যাকারিয়া আ.-এর পবিত্র জীবনের বিশদ বিবরণ জানা যায় না। এরপরও কুরআনুল কারিম, সিরাত ও ইতিহাসের নির্ভরযোগ্য বর্ণনাসমূহ থেকে যতটুকু জানা যায়, তা এমন : ইতোপূর্বে আমরা আলোচনা করেছি যে, বনি ইসরাইলে 'কাহিন' ছিলো একটি সম্মানিত ধর্মীয় পদবি। যিনি এই পদে অধিষ্ঠিত হতেন তার দায়িত্ব হতো, তিনি উপসনাগৃহ তথা সখরায়ে বাইতুল মুকাদ্দাসের পবিত্র সংস্কারসমূহ পালন করাতেন। এর জন্য বিভিন্ন গোত্র থেকে ভিন্ন 'কাহেন' নির্বাচিত হতেন এবং তারা নিজেদের পালা এলে এই খেদমত আঞ্জাম দিতেন।

হযরত যাকারিয়া আ. ছিলেন বনি ইসরাইলের একজন সম্মানিত কাহিন। তিনি ছিলেন তাদের মহান নবী। পবিত্র কুরআন তাকে নবীদের তালিকায় গণনাও করে ইরশাদ করেছে—

---

[২৪]. ফাতহুল বারি, খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ৩৬৫

[২৫]. ফাতহুল বারি, খণ্ড : ৬, তারিখে ইবনে কাসির : ২/৪৭

[২৬]. তারিখে ইবনে কাসির : ২/৪৭

وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَىٰ وَعِيسَىٰ وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ

'এবং যাকারিয়া, ইয়াহ্ইয়া, ঈসা ও ইল্‌য়াসকেও সৎপথে পরিচালিত করেছিলাম। এরা সকলই সজ্জনদের অন্তর্ভুক্ত।'

লুকা-এর ইঞ্জিলে তাঁকে 'কাহিন'[২৭] বলা হয়েছে—

> 'ইহুদিদের রাজা হিরোদেসের যুগে 'আবইয়াহ' দলে যাকারিয়া নামের এক কাহিন ছিলেন। তাঁর স্ত্রী ছিলেন হারুন আ.-এর একজন বংশধর। নাম আইয়াশা। স্বামী-স্ত্রী দু-জনই ছিলেন আল্লাহ তাআলার সদা যিকিরকারী, সত্যপরায়ণ। তারা খোদাওয়ান্দের সকল নির্দেশ ও বিধান ত্রুটিহীনভাবে মেনে চলতেন।'[২৮]

কিন্তু বার্নাবার ইঞ্জিলে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, তিনি আল্লাহর নবী ছিলেন। যেমন, হযরত মাসিহ আ. ইহুদিদেরকে সম্বোধন করে বললেন—

> সেই সময় অত্যাসন্ন যখন তোমাদের ওপর সেই নবীদের অভিশাপ নেমে আসবে যাদেরকে তোমরা যাকারিয়া আ.-এর যুগ পর্যন্ত হত্যা করেছিলে। আর যাকারিয়া আ.-কে উপাসনাগৃহ ও কুরবানির স্থলের মধ্যবর্তী জায়গায় হত্যা করা হয়।[২৯]

যাকারিয়া আ. ছিলেন হযরত দাউদ আ.-এর বংশধর। আর তাঁর পুণ্যবতী স্ত্রী ঈশা বা আল-ইয়াশা ছিলেন হযরত হারুন আ.-এর বংশধর।[৩০]

ইতোপূর্বে আমরা আলোচনা করেছি যে, পৃথিবীর ইতিহাসে যত নবী অতিবাহিত হয়েছেন, ব্যক্তিজীবনে তারা রাজা, ক্ষমতাবান বা অন্য যা কিছু হোন না কেনো; প্রত্যেকেই নিজের হাতের উপার্জন দিয়ে জীবন ধারণ

---

[২৭]. ইসলামের প্রথম যুগে আরবসমাজে যারা কাহিন তথা জ্যোতিষী হতেন এবং ভবিষ্যতের সংবাদ বলতেন, যাদের কথার ওপর ঈমান আনাকে ইসলামের সঙ্গে কুফরি করার নামান্তর বলা হয়েছে, সেই কাহিন আর বনি ইসরাইলিদের কাহিন এক নয়।

[২৮]. অধ্যায় : ১, আয়াত : ৫-৬

[২৯]. প্রসিদ্ধ চারটি ইঞ্জিল থেকে এটি সম্পূর্ণ আলাদা পঞ্চম ইঞ্জিল। হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম-এর প্রখ্যাত সহচর বারনাবা কর্তৃক সংকলিত। এটি রোমার পোপ সেকটাসের লাইব্রেরিতে সংরক্ষিত ছিলো। সেখানকার জনৈক পণ্ডিত গোপনে এটি সংগ্রহ করে মুদ্রণ করে ছড়িয়ে দেন। পরবর্তীকালে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। কেননা তার মাঝে নবি করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর অভ্যুদয় সম্পর্কে স্ফটিকের মতো স্বচ্ছ বর্ণনা ও সাক্ষ্য রয়েছে।

[৩০]. ফাতহুল বারি, খণ্ড : ৬। তারিখে ইবনে কাসির, খণ্ড : ২

করেন। তাঁরা কারো কাঁধের বোঝা হতেন না। এ কারণে প্রত্যেক নবী যখন তাঁর উম্মতের মধ্যে হেদায়েতের তাবলিগ করতেন, সঙ্গে সঙ্গে ঘোষণা করতেন—

وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ

'আমি এই তাবলিগের জন্য তোমাদের কাছ থেকে কোনো প্রতিদান চাই না। মহান আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো কাছে আমাদের প্রতিদান নেই।'

যেমন, হযরত যাকারিয়া আ. জীবিকা নির্বাহের জন্য করাতির কাজ করতেন। এ সম্পর্কে মুসলিম, ইবনে মাজাহ ও মুসনাদে আহমদে স্পষ্ট বর্ণনা রয়েছে—

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : كان زكريا نجارا.

'হযরত আবু হুরায়রা রা. হতে বর্ণিত, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, যাকারিয়া ছিলেন কাঠমিস্ত্রি।' [৩১]

হযরত যাকারিয়া আ.-এর বংশে (অর্থাৎ হযরত সুলাইমান বিন দাউদ আ.-এর বংশে) ইমরান বিন না-কি ও তাঁর স্ত্রী হান্নাহ বিনতে ফাকুদ ছিলেন অত্যন্ত সৎকর্মপরায়ণ।[৩২] তারা দরবেশি জীবন কাটাতেন। তবে নিঃসন্তান ছিলেন। হযরত ঈসা আ.-এর জীবনীতে আসবে যে, হান্নাহ-এর দোয়ার বদৌলতে তাঁর ঘরে একজন মেয়েশিশু জন্মগ্রহণ করে। তারা মেয়েটির নাম রাখেন, মারইয়াম। হান্নাহ তাঁর মান্নত অনুসারে মারইয়াম আলাইহাস সালামকে বাইতুল মুকাদ্দাসের জন্য উৎসর্গ করলেন। তখন প্রশ্ন উঠলো, এই ছোট্ট মেয়ের প্রতিপালন, অভিভাবকত্ব ও রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব কাকে দেয়া যায়? আল্লাহর এই মকবুল মান্নত নিয়ে কাহিনদের মধ্যে বাদানুবাদ সৃষ্টি হলো। অবশেষে লটারি হয়। সেখানে হযরত যাকারিয়া আ.-এর নাম বেরিয়ে আসে। তিনিই মারইয়ামের অভিভাবক নিযুক্ত হন। ইরশাদ হয়েছে— وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا 'আর তাঁকে যাকারিয়ার তত্ত্বাবধানে সমর্পণ করলেন।'

সুরা আলে ইমরানে এসেছে—

---

[৩১]. কিতাবুল আম্বিয়া

[৩২]. ফাতহুল বারি : ৬/৩৬৪

وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ

'মারইয়ামের তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব তাদের মধ্য হতে কে গ্রহণ করবে এর জন্য যখন তারা তাদের কলম নিক্ষেপ করছিলো আপনি তখন তাদের নিকট ছিলেন না এবং তারা যখন বাদানুবাদ করছিলো তখনও আপনি তাদের নিকট ছিলেন না।' [সুরা আলে ইমরান : আয়াত ৪৪]

সিরাত ও ইতিহাসের সংকলকগণ লিখেছেন, হযরত যাকারিয়া আ. এমনিতেই হযরত মারইয়াম আলাইহাস সালামের প্রতিপালনের হকদার ছিলেন। কারণ হলো, বশির বিন ইসহাক 'আল মুবতাদা' গ্রন্থে নকল করেছেন যে, হযরত যাকারিয়া আ.-এর স্ত্রী ঈশা আর হযরত মারইয়ামের জননী হান্নাহ ছিলেন সহদোরা বোন।[৩৩] আর খালা হয়ে থাকেন মায়ের সমমর্যাদার। যেমনটি খোদ নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হামযা রা.-এর মেয়ে আম্মারাহ সম্পর্কে বলেছিলেন যে, জাফরের স্ত্রী তাঁর লালন-পালন করবে। কেননা, সে আম্মারার খালা। আর খালা হন মায়ের সমতুল্য।[৩৪]

যখন হযরত মারইয়াম আলাইহাস সালাম প্রাপ্তবয়স্কা হন, তখন যাকারিয়া আ. তাঁর জন্য হায়কালের কাছাকাছি একটি নির্জন কক্ষের ব্যবস্থা করে দেন। সেখানে তিনি দিনের বেলা আল্লাহর ইবাদতে মগ্ন থাকতেন আর রাতে আপন খালার কাছে এসে রাত্রিযাপন করতেন।

হযরত যাকারিয়া আ. যখনই হযরত মারইয়ামের কক্ষে প্রবেশ করতেন তখন দেখতে পেতেন যে, তার কাছে নানা জাতের অমৌসুমি ফল রয়েছে। একদিন তিনি বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, মারইয়াম, তোমার কাছে এগুলো কোত্থেকে আসে? মারইয়াম আলাইহাস সালাম বললেন, এগুলো আল্লাহর পক্ষ থেকে আসে। নিঃসন্দেহে আল্লাহ যাকে চান, অগুনতি রিযিক দান করেন। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে—

كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا قَالَ يَا مَرْيَمُ أَنَّى لَكِ هَذَا قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ

---

[৩৩]. ফাতহুল বারি : ৬/৩৬৪

[৩৪]. বুখারি, বাবুল হিদানাহ

'যখনই যাকারিয়া মেহরাবের মধ্যে তাঁর কাছে আসতেন তখনই কিছু খাবার দেখতে পেতেন। জিজ্ঞেস করতেন– 'মারইয়াম, কোথা থেকে এসব তোমার কাছে এলো? তিনি বলতেন, 'এসব আল্লাহর নিকট থেকে আসে। আল্লাহ যাকে ইচ্ছে বেহিসেব রিযিক দান করেন।' [সুরা আলে ইমরান : আয়াত ৩৭]

মুজাহিদ, ইকরামা, সাঈদ বিন যুবায়ের, দহ্হাক, কাতাদাহ, ইবরাহিম নাখয়ি রহ. উল্লিখিত আয়াতের رِزْقًا শব্দের তাফসিরে বলেছেন, যাকারিয়া আ. মারইয়াম আলাইহাস সালামের কাছে অমৌসুমি ফল রাখা পেতেন।[৩৫]

যাকারিয়া আ.-এর কোনো সন্তান ছিলো না। তিনি অনুভব করতেন যে, আমি সন্তানের দৌলত থেকে বঞ্চিত; কিন্তু তিনি এর চেয়ে বেশি চিন্তা করতেন এ নিয়ে যে, আমার পরিবার ও সুহৃদদের মধ্যে এমন যোগ্য কেউ নেই, যে আমার পরে বনি ইসরাইলের পথ দেখানোর দায়িত্ব পালন করতে সমর্থ হবে। সুতরাং আল্লাহ যদি আমার ঔরসে এমন কোনো নেককার সৎ ছেলে সৃষ্টি করতেন তাহলে আমি প্রশান্তি বোধ করতাম যে, আমার পরে বনি ইসরাইলের পথপ্রদর্শনের দায়িত্ব পালন করার মতো যোগ্য উত্তরসূরি আছে।[৩৬]

কিন্তু যেহেতু তাঁর বয়স ইবনে কাসির রহ.-এর বর্ণনা অনুযায়ী ৭৭ বছর, সা'লাবির বর্ণনা অনুসারে ৯০ বা ৯২ অথবা ১২০ বছর হয়ে গেছে,[৩৭] অপরদিকে তাঁর স্ত্রী বন্ধ্যাত্বের শিকার, এ কারণে বাহ্যিক উপকরণের দিকে তাকিয়ে তিনি নিরাশ হয়ে পড়েছিলেন যে, এখন আর সন্তান জন্ম নেয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই।

কিন্তু যখন তিনি মারইয়াম আলাইহাস সালামের কাছে অমৌসুমি ফল দেখলেন আর তিনি এ কথা জানতেন যে, এগুলো হলো মারইয়ামের প্রতি মহান আল্লাহর দয়া ও অনুকম্পা তখন সঙ্গে সঙ্গে তার মনের ভেতর এ আবেগ উথলে উঠলো যে, মারইয়ামকে যে মহান সত্তা এভাবে বিনা মৌসুমে ফল দিতে পারেন, তিনি কি আমাকে বর্তমান হতাশাব্যঞ্জক অবস্থায় জীবনের ফল (সন্তান) দিতে পারেন না? কাজেই আমার হতাশা সম্পূর্ণ ভুল। নিঃসন্দেহে যে মহান সত্তা মারইয়ামের ওপর দয়া ও অনুগ্রহ করেছেন

---

[৩৫]. তাফসিরে ইবনে কাসির : ২/৩৬০

[৩৬]. ফাতহুল বারি : ৬/৩৬৪

[৩৭]. আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া : ২/৪৯

তিনি অবশ্যই আমার ওপরও দয়া ও অনুগ্রহ করবেন। তাই তিনি মহান আল্লাহর কাছে মিনতিভরা প্রার্থনা করলেন, 'হে আমার প্রভু, আমি একা। আমার উত্তরসূরির মুখাপেক্ষী। যদিও আপনার মহান সত্তা-ই আমার প্রকৃত ওয়ারিস। হে আমার প্রভু, আমাকে পবিত্র সন্তান দান করুন। আমি বিশ্বাস করি যে, আপনি মুখাপেক্ষীর দোয়া অবশ্যই কবুল করে থাকেন।'

একজন নবীর দোয়া তাও আবার নিজের ব্যক্তিগত কোনো প্রয়োজন নিয়ে নয়; বরং স্বজাতির হেদায়েতের প্রয়োজনে হাত তুলেছেন– সঙ্গে সঙ্গে মঞ্জুর হয়ে গেলো। হযরত যাকারিয়া যখন হাইকালে (উপাসনাগৃহ) ইবাদতে নিমগ্ন তখন আল্লাহর এক ফেরেশতা তার সামনে হাজির হলেন। তিনি সুসংবাদ দিলেন, তোমার এক ছেলে হবে। তার নাম রাখবে, ইয়াহইয়া। সুসংবাদটি শুনে হযরত যাকারিয়া আ. খুবই খুশি হলেন। তিনি বিস্ময়ভরে জিজ্ঞেস করলেন, এ সুসংবাদ কীকরে পূর্ণ হবে? অর্থাৎ আমি কি যৌবন ফিরে পাবো না-কি আমার স্ত্রীর বন্ধ্যাত্ব দূর হয়ে যাবে। ফেরেশতা উত্তরে বললেন, আমি আপনাকে শুধু এতটুকুই বলতে পারবো যে, অবস্থা যা-ই হোক না কেনো; আপনার অবশ্যই ছেলে হবে। কেননা, আল্লাহর সিদ্ধান্তে নড়চড় হয় না। আপনার আল্লাহ বলেছেন, এটি তার পক্ষে খুবই সহজ। অর্থাৎ আমি এর জন্য আমার ইচ্ছেমাফিক যে কোনো পথই অবলম্বন করতে পারি। আমি কি তোমাকে শূন্য থেকে সৃষ্টি করি নি?

তখন যাকারিয়া আ. আল্লাহর দরবারে নিবেদন করলেন, হে আল্লাহ, আমাকে এমন কোনো নিদর্শন প্রদান করুন, যার মাধ্যমে অবগতি লাভ করা যাবে যে, সুসংবাদটি অস্তিত্বের আকার ধারণ করেছে। আল্লাহ বললেন, আলামত হলো, যখন তুমি দেখবে যে, তিন দিন পর্যন্ত কথা বলতে পারছো না, সবকাজ ইঙ্গিতে আদায় করতে হচ্ছে তখন তুমি বুঝে নেবে যে, তোমার সুসংবাদ অস্তিত্বের দিকে পথ ধরেছে। কিন্তু সেই দিনগুলোতে তুমি আল্লাহর তাসবিহ, তাহলিলে খুব বেশি মগ্ন থাকবে। যখন ওই সময় ঘনিয়ে এলো তখন হযরত যাকারিয়া আ. আল্লাহর স্মরণে আরো বেশি নিমগ্ন হয়ে পড়লেন। এর কারণ হলো, হযরত ইয়াহইয়া আ.-এর জন্মের সুসংবাদ পেয়ে যেভাবে হযরত যাকারিয়া আ. খুবই উৎফুল্ল ও উল্লসিত হয়েছিলেন তেমনি এটি বনি ইসরাইলিদের জন্যও নিয়ে এসেছিলো ভীষণ আনন্দের উপলক্ষ্য। এভাবে যে, হযরত যাকারিয়া আ. এতদিনে সত্যিকার অর্থে একজন উপযুক্ত স্থলাভিষিক্ত এবং তাঁর জ্ঞান, প্রজ্ঞা ও নবুওতের প্রকৃত উত্তরসূরি পেতে চলেছেন।

এতটুকু ঘটনাই পবিত্র কুরআন ও বিশুদ্ধ হাদিসসমূহের মাধ্যমে আমরা পেয়েছি। কাজেই শুধু এতটুকুর ওপরই আস্থা রাখা যায়। এর বাইরে আরো দু-ধরনের তথ্যের উৎস রয়েছে। একটি হলো, ইসরাইলি রেওয়ায়েত, যা অধিকাংশ ক্ষেত্রে যদিও কুরআন ও হাদিসের ভাষ্যের সঙ্গে সহমত থেকেছে, তবে কিছু কিছু ক্ষেত্রে তার ভাষ্য সম্পূর্ণ প্রত্যাখ্যাত। আর দ্বিতীয়টি হলো, কতিপয় মনীষার বাণী। যেগুলো রেওয়ায়েত ও দিরায়াত (সনদের মান ও ভাষ্যের মান) উভয় বিচারেই প্রমাণযোগ্য নয়। এগুলোর কোনো সহিহ সনদও নেই। সুরা মারইয়ামে ইরশাদ হয়েছে—

كهيعص () ذِكْرُ رَحْمَتِ رَبِّكَ عَبْدَهُ زَكَرِيَّا () إِذْ نَادَى رَبَّهُ نِدَاءً خَفِيًّا () قَالَ رَبِّ إِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا () وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا () يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا () يَا زَكَرِيَّا إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ اسْمُهُ يَحْيَى لَمْ نَجْعَلْ لَهُ مِنْ قَبْلُ سَمِيًّا () قَالَ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا وَقَدْ بَلَغْتُ مِنَ الْكِبَرِ عِتِيًّا () قَالَ كَذَلِكَ قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيْئًا () قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِي آيَةً قَالَ آيَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلَاثَ لَيَالٍ سَوِيًّا () فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ مِنَ الْمِحْرَابِ فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ أَنْ سَبِّحُوا بُكْرَةً وَعَشِيًّا ()

'কাফ-হা-ইয়া-আইন-সাদ। এটা আপনার পালনকর্তার অনুগ্রহের বিবরণ তাঁর বান্দা যাকারিয়ার প্রতি। যখন সে তাঁর পালনকর্তাকে আহ্বান করছিলো নিভৃতে। সে বললো, হে আমার পালনকর্তা, আমার অস্থি বয়স-ভারাবনত হয়েছে; বার্ধক্যে মস্তক সুশুভ্র হয়েছে; হে আমার পালনকর্তা, আপনাকে ডেকে আমি কখনও বিফলমনোরথ হই নি। আমি ভয় করি আমার পর আমার স্বগোত্রকে এবং আমার স্ত্রী বন্ধ্যা; কাজেই আপনি নিজের পক্ষ থেকে আমাকে একজন কর্তব্য পালনকারী দান করুন। সে আমার স্থলাভিষিক্ত হবে ইয়াকুব-বংশের এবং হে আমার পালনকর্তা, তাকে করুন সন্তোষজনক। হে যাকারিয়া, আমি তোমাকে এক পুত্রের সুসংবাদ দিচ্ছি, তার নাম হবে ইয়াহইয়া। ইতোপূর্বে এ নামে আমি কারও নামকরণ করি নি। সে বললো, হে আমার পালনকর্তা, কেমন করে আমার পুত্র হবে অথচ আমার স্ত্রী যে বন্ধ্যা; আর আমিও যে বার্ধক্যের শেষ প্রান্তে উপনীত। তিনি বললেন, এমনিতেই হবে। তোমার পালনকর্তা বলে দিয়েছেন, এটা আমার

পক্ষে সহজ। আমি তো পূর্বে তোমাকে সৃষ্টি করেছি এবং তুমি কিছুই ছিলে না। সে বললো, হে আমার পালনকর্তা, আমাকে একটি নিদশন দিন। তিনি বললেন, তোমার নিদর্শন এই যে, তুমি সুস্থ অবস্থায় তিন দিন মানুষের সঙ্গে কথাবার্তা বলবে না। অতঃপর সে কক্ষ থেকে বের হয়ে তার সম্প্রদায়ের কাছে এলো এবং ইঙ্গিতে তাদেরকে সকাল-সন্ধ্যায় আল্লাহকে স্মরণ করতে বললো।' [সুরা মারইয়াম : আয়াত ১-১১]

সুরা আম্বিয়ায় ইরশাদ হয়েছে—

وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ () فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَىٰ وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ ()

'এবং যাকারিয়ার কথা স্মরণ করুন, যখন সে তার পালনকর্তাকে আহ্বান করছিলো : হে আমার পালনকর্তা, আমাকে একা রেখো না। তুমি তো উত্তম ওয়ারিস। অতঃপর আমি তার দোয়া কবুল করেছিলাম। তাকে দান করেছিলাম ইয়াহইয়া এবং তার জন্য তার স্ত্রীকে প্রসবযোগ্য করেছিলাম। তারা সৎকর্মে প্রতিযোগিতা, তারা আশা ও ভীতি সহকারে আমাকে ডাকতো এবং তারা ছিলো আমার কাছে বিনীত।' [সুরা আম্বিয়া : আয়াত ৮৯-৯০]

সুরা আলে ইমরানে ইরশাদ হয়েছে—

هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِن لَّدُنكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ () فَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ أَنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَىٰ مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَسَيِّدًا وَحَصُورًا وَنَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ () قَالَ رَبِّ أَنَّىٰ يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَقَدْ بَلَغَنِيَ الْكِبَرُ وَامْرَأَتِي عَاقِرٌ قَالَ كَذَٰلِكَ اللَّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ () قَالَ رَبِّ اجْعَل لِّي آيَةً قَالَ آيَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ إِلَّا رَمْزًا وَاذْكُر رَّبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ ()

'সেখানেই যাকারিয়া তাঁর পালনকর্তার নিকট প্রার্থনা করলেন। বললেন, হে আমার পালনকর্তা, তোমার নিকট থেকে আমাকে পূতঃপবিত্র সন্তান দান করো। নিশ্চয়ই তুমি প্রার্থনা শ্রবণকারী। যখন তিনি কামরার ভেতরে নামাযে দাঁড়িয়েছিলেন, তখন ফেরেশতারা তাকে ডেকে বললেন যে, আল্লাহ তোমাকে সুসংবাদ দিচ্ছেন ইয়াহইয়া সম্পর্কে, যিনি সাক্ষ্য দেবেন আল্লাহর

নির্দেশের সত্যতা সম্পর্কে, যিনি নেতা হবেন এবং নারীদের সংস্পর্শে যাবেন না। তিনি অত্যন্ত সৎকর্মশীল নবী হবেন। তিনি বললেন, হে পালনকর্তা, কেমন করে আমার পুত্র-সন্তান হবে, আমার যে বার্ধক্য এসে গেছে, আমার স্ত্রীও যে বন্ধ্যা। বললেন, আল্লাহ এমনিভাবেই যা ইচ্ছে করে থাকেন। তিনি বললেন, হে আমার পালনকর্তা, আমার জন্য কিছু নিদর্শন দাও। তিনি বললেন, তোমার জন্য নিদর্শন হলো, তুমি তিন দিন পর্যন্ত কারো সঙ্গে কথা বলবে না। তবে ইশারা ইঙ্গিত করতে পারবে এবং তোমার পালনকর্তাকে অধিক পরিমাণে স্মরণ করতে থাকবে আর সকাল-সন্ধ্যা তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করবে।' [সুরা আলে ইমরান : আয়াত ৩৮-৪১]

তাফসির বিষয়ক কয়েকটি সূক্ষ্ম আলোচনা

১। সুরা আলে ইমরান ও সুরা মারইয়ামে এসেছে, যখন যাকারিয়া আ.-কে হযরত ইয়াহইয়া আ.-এর সুসংবাদ দেয়া হয়, তখন তিনি বিস্ময় প্রকাশ করেছিলেন যে, যখন আমি দুর্বল হয়ে পড়েছি, আমার স্ত্রী বন্ধ্যাত্বের শিকার, তখন কী করে এই সুসংবাদ বাস্তবায়িত হবে? শাহ আবদুল কাদির রহ. এ প্রসঙ্গে চমৎকার কথা বলেছেন, 'দুষ্প্রাপ্য ও অভিন্ন জিনিস চাওয়ার সময় বিস্মিত হন নি; কিন্তু যখন শুনলেন যে, পেতে যাচ্ছেন, তখন বিস্ময় জেগেছে।'

আমরা ইতোপূর্বে একাধিকবার আলোচনা করেছি যে, আল্লাহর নিঃসীম শক্তির ব্যাপারে সন্দিহান হয়ে আম্বিয়া আলাইহিমুস সালাম এ জাতীয় প্রশ্ন করতেন না। বরং তাঁদের উদ্দেশ্য হতো, আপনার এই কুদরতের চমৎকারিত্ব কীভাবে, কেমন করে অস্তিত্ব লাভ করে, এটি যদি বলে দেয়া হতো, তাহলে ভালো হতো। কিন্তু যেহেতু প্রশ্নের বাহ্যিক অবস্থাদৃষ্টে মনে হতো, তারা বুঝি বিষয়টির সংঘটন নিয়ে সন্দেহের শিকার, –এ কারণে আল্লাহর চিরন্তন নীতি হলো– প্রথমে বিষয়টির ঠিক সেই পদ্ধতিতে উত্তর দেয়া হতো, যাতে তারা সতর্ক ও সচেতন হন। যদিও মানবিক বোধের বিচারে তাদের সেই প্রশ্ন পাকড়াও করার মতো নয়, কিন্তু তাঁদের অত্যুচ্চ মর্যাদার সঙ্গে এটি সঙ্গতিপূর্ণ নয়। এভাবে যে, আপনি আল্লাহর এত নিকটতম বান্দা হওয়া সত্ত্বেও কী করে এ জাতীয় ব্যাপারে বিস্ময় প্রকাশ করছেন! হযরত শাহ আবদুল কাদির রহ. তাঁর অতিসংক্ষিপ্ত দুটি বাক্যে সেদিকেই ইশারা করেছেন। এরপর মহান আল্লাহ প্রশ্নের অন্তর্নিহিত মর্মের দিকে তাকিয়ে প্রকৃত যে উত্তর প্রাপ্য; সেটাও অবশ্যই জানিয়ে দিতেন।

যাতে তাঁদের মন প্রশান্ত ও নিশ্চিন্ত হয়ে যায়। হযরত যাকারিয়া আ.-এর ক্ষেত্রেও মহান আল্লাহর সেই চিরন্তন নীতির বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। প্রথমে আল্লাহ যাকারিয়ার বিস্ময় অনুযায়ী উত্তর দিয়েছেন। এরপর তাঁর প্রশ্নের অন্তর্নিহিত মর্ম অনুযায়ী উত্তর দিয়েছেন যে, وَاَصْلَحْنَا لَهٗ زَوْجَهٗ : আমি তার স্ত্রীর রোগ সারিয়ে তাকে সুস্থ করে দিলাম।

২। সুরা মারইয়ামে এসেছে, হযরত যাকারিয়া আ. সন্তানের দোয়া প্রার্থনার প্রাক্কালে আল্লাহর দরবারে মিনতি করেছিলেন, يَّرِثُنِيْ وَيَرِثُ مِنْ اٰلِ يَعْقُوْبَ : [যে আমার উত্তরাধিকারী হবে এবং উত্তরাধিকারী হবে ইয়াকুব পরিবারের]। এখানে উত্তরাধিকার বলতে উদ্দেশ্য হলো, জ্ঞান, প্রজ্ঞা ও নবুওতের উত্তরাধিকার। যেমনটি হযরত দাউদ ও সুলাইমান আলাইহিমাস সালামের ঘটনায় অতিবাহিত হয়েছে। এখানে উল্লিখিত অর্থ আরো বেশি স্পষ্ট। হযরত যাকারিয়া আ. মাল-সম্পদ থেকে সম্পূর্ণ শূন্য ছিলেন। তিনি করাতি পেশার মাধ্যমে প্রতিদিনের জীবনধারণের মতো আহার সংগ্রহ করতেন। তাঁর কাছে সে দৌলত কোত্থেকে আসবে, যার উত্তরাধিকারের জন্য তাঁর অন্তরে আকাঙ্ক্ষা দানা বাঁধবে। এখানে সম্পদের উত্তরাধিকার বুঝে না আসার আরো একটি কারণ রয়েছে। তা হলো, যদি সেটাই তাঁর উদ্দেশ্য হতো, তাহলে তাঁর يَّرِثُنِيْ [যে আমার উত্তরাধিকারী হবে] এতটুকু বলা উচিত ছিলো। এখানে وَيَرِثُ مِنْ اٰلِ يَعْقُوْبَ [এবং উত্তরাধিকারী হবে ইয়াকুব পরিবারের] বলার কী অর্থ? ইয়াহইয়া আ. একা গোটা ইয়াকুব বংশের কী করে আর্থিক উত্তরাধিকারী হবেন?

৩। সুরা আলে ইমরান ও সুরা মারইয়ামে এসেছে, قَالَ اٰيَتُكَ اَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلٰثَ لَيَالٍ سَوِيًّا [তোমার নিদর্শন এই যে, তুমি সুস্থ অবস্থায় তিন দিন মানুষের সঙ্গে কথাবার্তা বলবে না]। আমরা উল্লিখিত আয়াতের তাফসির করেছি সংখ্যাগরিষ্ঠ তাফসিরকারের অভিমত অনুযায়ী। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস, মুজাহিদ, ইকরামা, কাতাদাহসহ অপরাপর উলামায়ে কেরাম এর তাফসিরে বলেছেন—

اعتقل لسانه من غير مرضى ولا علة. وقال زيد بن أسلم من غير خرس، ولا يستطيع ان يكلم قومة إلا إشارة.

তাঁর মুখ তিন দিনের জন্য কোনো ধরনের রোগ-ব্যাধি ছাড়াই বন্ধ হয়ে গিয়েছিলো। যায়দ বিন আসলাম বলেন, তাঁর মুখ তিন দিনের জন্য বন্ধ হয়ে গিয়েছিলো। তার অর্থ এ নয় যে, তিনি

বোবা হয়ে গিয়েছিলেন। বরং এ সময় তিনি তাঁর কওমের সঙ্গে ইশারা না করে মনের ভাব ব্যক্ত করতে পারতেন না।[৩৮]

উল্লিখিত আয়াতে سَوِيًّا শব্দ এসেছে। এর কী অর্থ? এ নিয়ে দুটি অভিমত রয়েছে। একটি হলো সুস্থ ও নিরোগ। আর দ্বিতীয় হলো, একাধারে। প্রথমটি জমহুর উলামায়ে কেরামের অভিমত। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. থেকে এক রেওয়ায়েতে আওফি দ্বিতীয় অভিমতটি নকল করেছেন। হাফেয ইমাদুদ্দিন বিন কাসির জমহুরের অভিমতকে প্রাধান্য দিয়েছেন।[৩৯] লুকার ইঞ্জিলে ঘটনার যে বিবরণ আছে, তা জমহুরের অভিমতের সঙ্গে মিলে যায়। সেখানে এসেছে—

'যাকারিয়া ফেরেশতাকে বললেন, আমি ত কীকরে জানবো? কেননা, আমি বৃদ্ধ হয়ে গেছি আর আমার স্ত্রী বন্ধ্যা। ফেরেশতা বললেন, আমি জিবরাঈল। মহান আল্লাহর দরবারে দাঁড়িয়ে থাকি। আমাকে প্রেরণ করা হয়েছে, যেনো আমি আপনার সঙ্গে কথা বলি এবং আপনাকে এ বিষয়গুলোর সুসংবাদ প্রদান করি। যেদিন আপনি নীরব থাকবেন, কথা বলতে পারবেন না; সেদিন পর্যন্ত দেখে যান।'[৪০]

কিন্তু মাওলানা আযাদ তরজুমানুল কুরআনে যে তাফসির লিখেছেন, তা সংখ্যাগরিষ্ঠ উলামায়ে কেরামের তাফসির থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। তিনি লিখেছেন, 'যাকারিয়া আ.-কে বলা হলো, যেভাবে বনি ইসরাইল রোযা রাখে এভাবে তুমি তিন দিন পানাহার থেকে বিরত থাকো সঙ্গে সঙ্গে মৌনতা অবলম্বন করো। তাহলে প্রতিশ্রুত সুসংবাদের সময় শুরু হয়ে যাবে।' তিনি লুকার ইঞ্জিলের উপরোক্ত উদ্ধৃতি নকল করে লিখেছেন, 'কুরআন বলে নি, হযরত যাকারিয়া আ. বোবা হয়ে গেছেন। এটি নিশ্চয়ই পরবর্তী সময়ের ব্যাখ্যা, যা রীতি অনুযায়ী গড়ে উঠেছে। পরিষ্কার বুঝে আসে যে, হযরত যাকারিয়াকে রোযা রাখা ও ইবাদতে নিমগ্ন হওয়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। আর ইহুদি সমাজে রোযার অন্যতম অনুষঙ্গ ছিলো, চুপ থাকা।'

---

[৩৮]. তাফসিরে ইবনে কাসির : ৩/১১২

[৩৯]. তাফসিরে ইবনে কাসির : ৩/১১২

[৪০]. লূকা, অধ্যায় : ১০, আয়াত : ১৮-২০

আরবি ব্যাকরণ অনুযায়ী أَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ এর উল্লিখিত ব্যাখ্যা যদিও দেয়া যেতে পারে কিন্তু আমাদের মহান পূর্বসূরি থেকে যেহেতু সর্বসম্মতিক্রমে এর বিপরীত বর্ণিত রয়েছে, কাজেই এটি আমাদের কাছে গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। বাকি থাকলো 'বোবা হওয়া'-এর বিষয়টি; আমরা ইতোপূর্বে আলোচনা করেছি যে, এমন অভিমত কেউ দেন নি যে, তিনি বোবা হওয়া বা এ জাতীয় কোনো রোগে আক্রান্ত হয়েছিলেন। বরং তার মুখে বাকশক্তি সুস্থ্য ও সবল থাকা সত্ত্বেও নিদর্শন হিসেবে তিন দিনের জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে তাঁর মুখে প্রতিবন্ধক সৃষ্টি করা হয়েছিলো।

৪। সুরা আলে ইমরানে এসেছে, وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا উল্লিখিত আয়াতাংশের তাফসিরে আরেকটি অভিমত পাওয়া যায়। তা হলো, এখানে রিযিক দ্বারা উদ্দেশ্য জ্ঞান ও প্রজ্ঞার পুস্তিকা। আমরা উল্লিখিত অভিমত গ্রহণ করি নি। কারণ এক্ষেত্রে সংখ্যাগরিষ্ঠ উলামায়ে কেরাম যে অভিমত দিয়েছেন, সেটাই তার পরিষ্কার ও সহজাত অর্থ।

হযরত ইয়াহইয়া

আলাইহিস সালাম

কুরআনে হযরত ইয়াহ্ইয়া আলাইহিস সালাম-এর আলোচনা

পবিত্র কুরআনের সেই সুরাসমূহে হযরত ইয়াহইয়া আ.-এর আলোচনা এসেছে, যেখানে তাঁর পিতা হযরত যাকারিয়া আ.-এর আলোচনাও এসেছে। অর্থাৎ আলে ইমরান, আনআম, মারইয়াম ও আম্বিয়া।

নাম ও বংশপরিচিতি

তিনি ছিলেন হযরত যাকারিয়া আ.-এর ছেলে ও তাঁর নবীসুলভ দোয়ার ফসল। তাঁর নাম রেখেছেন স্বয়ং আল্লাহ তাআলা এবং সেটি এমনই এক নাম ছিলো যে, ইতোপূর্বে তাঁর পরিবারের অন্য কারো এ নাম রাখা হয় নি—

يَا زَكَرِيَّا إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ اسْمُهُ يَحْيَىٰ لَمْ نَجْعَل لَّهُ مِن قَبْلُ سَمِيًّا

'হে যাকারিয়া, আমি তোমাকে এক পুত্রের সুসংবাদ দিচ্ছি, তার নাম হবে ইয়াহ্ইয়া। ইতোপূর্বে এ নামে আমি কারও নামকরণ করিনি।' [সুরা মারইয়াম: আয়াত ৭]

জীবনবৃত্তান্ত

মালেক বিন আনাস রা. বলেন, ইয়াহইয়া বিন যাকারিয়া ও ঈসা বিন মারইয়ামের মাতৃগর্ভে অবস্থান একই সময়ে হয়েছিলো। সা'লাবি বলেন, হযরত ঈসা আ. থেকে ছয় মাস পূর্বে হয়েছিলো।[৪১] লুকার ইঞ্জিলে এসেছে, যখন যাকারিয়া আ.-এর স্ত্রী আল ইয়াশা গর্ভবতী অবস্থায় ছয় মাস পেরিয়েছিলেন, তখন জিবরাইলি আ. হযরত মারইয়ামের কাছে এসেছিলেন এবং এ সময় তিনি তাকে এ সুসংবাদ প্রদান করেন—

> 'আর দেখো, তোমার আত্মীয় আল ইয়াশারও বৃদ্ধবয়সে ছেলে হবে। এত দিন যাকে বন্ধ্যা বলা হতো, আজ সে ছয় মাসের গর্ভবতী'।[৪২]

---

[৪১]. ফাতহুল বারি : ৬/৩৬৪

[৪২]. অধ্যায় : ১, আয়াত : ২৬

এর থেকে বুঝে আসে, হযরত ইয়াহ্ইয়া আ. হযরত ঈসা আ. থেকে ছয় মাসের বড় ছিলেন।

ইয়াহ্ইয়া আ.-এর জন্য যাকারিয়া আ. দোয়া করেছিলেন, সে যেনো পূতঃপবিত্র সন্তান হয়। কুরআন জানিয়েছে যে, মহান আল্লাহ তাঁর প্রার্থনা শুনেছিলেন। তাইতো হযরত ইয়াহ্ইয়া আ. ছিলেন অসাধারণ খোদাভীরু, দুনিয়ার প্রতি নির্মোহ ও শ্রেষ্ঠতম সজ্জন ব্যক্তিত্বের অধিকারী। তিনি জীবনে বিয়ে করেন নি। তাঁর মনে কখনো কোনো পাপকাজের বাসনা জাগে নি। শ্রদ্ধেয় জনকের মতো তিনিও ছিলেন মহান আল্লাহর সম্মানিত নবী। আল্লাহ তাঁকে শৈশবেই জ্ঞানী ও প্রজ্ঞাবান বানিয়েছিলেন। তাঁর জীবনের সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব ছিলো, তিনি হযরত ঈসা আ.-এর আগমনের সুসংবাদ দিতেন এবং তাঁর আগমনের পূর্বে হেদায়েতের জন্য ভূপৃষ্ঠকে উপযুক্ত ও সমতল বানিয়েছিলেন। কুরআনে ইরশাদ হয়েছে—

فَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ أَنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَىٰ مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَسَيِّدًا وَحَصُورًا وَنَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ ()

'যখন তিনি কামরার ভেতরে নামাযে দাঁড়িয়েছিলেন, তখন ফেরেশতারা তাকে ডেকে বললেন যে, আল্লাহ তোমাকে সুসংবাদ দিচ্ছেন ইয়াহ্ইয়া সম্পর্কে, যিনি সাক্ষ্য দেবেন আল্লাহর নির্দেশের সত্যতা সম্পর্কে, যিনি আল্লাহ ও তাঁর বান্দাদের চোখে প্রিয় হবেন এবং নারীদের সংস্পর্শে যাবেন না। তিনি অত্যন্ত সৎকর্মশীল নবী হবেন।' [সুরা আলে ইমরান: আয়াত ৩৯]

উল্লিখিত আয়াতে سيد [সাইয়িদ] শব্দের কী অর্থ? সিরাতের বিভিন্ন কিতাবে অনেকগুলো অর্থ পাওয়া যায়। যেমন, ধৈর্যশীল, জ্ঞানী, ধর্মীয় বিধানাবলির পণ্ডিত, দীন-দুনিয়ার নেতা, সম্ভ্রান্ত, খোদাভীরু, আল্লাহর প্রিয় ও মনোনীত। যেহেতু শেষ অর্থটির মধ্যে পূর্বের সমস্ত অর্থ পাওয়া যায়, এ কারণে আয়াতের অনুবাদের ক্ষেত্রে আমরা সেটিকেই চয়ন করেছি।[৪৩]

তদ্রূপ حصور [হাসুর] শব্দেরও অনেকগুলো অর্থ পাওয়া যায়। 'যে ব্যক্তি নারীর সংস্পর্শে যায়নি', 'যে ব্যক্তি সর্বপ্রকার গুনাহ থেকে মুক্ত এবং যার মনে গুনাহের বাসনা জাগে নি', 'যে ব্যক্তি আত্মনিয়ন্ত্রণে সমর্থ ও মনের কামনাকে দমন করতে সক্ষম'।[৪৪]

---

[৪৩]. তাফসিরে ইবনে কাসির : ২/৩৬১

[৪৪]. তাফসিরে ইবনে কাসির : ২/৩৬১

আমাদের মতে উল্লিখিত অর্থগুলোর সারমর্ম এক। কারণ হলো, অভিধানে حصر শব্দের অর্থ হলো, প্রতিবন্ধক। حصور শব্দটি اسم مبالغة [অধিক কর্ত বোধক বিশেষণ]-এর সিগা। কাজেই এখানে এর ব্যাখ্যা হবে, আল্লাহর নির্দেশে যেসব বিষয় থেকে আত্মরক্ষা করা জরুরি, সেগুলো থেকে যে নিজেকে সংবরণ করতে পারে সেই حصور। যেহেতু হযরত ইয়াহইয়া আ. এই সবগুলো গুণ ও বিশেষণের অধিকারী ছিলেন, কাজেই উল্লিখিত সবগুলো অর্থ একই সময় তাঁর ওপর প্রযোজ্য হতে কোনো বাধা নেই।

এর বাইরে কেউ কেউ অন্য অর্থও করেছেন। যেমন, পুরুষত্বহীন। এখানে এই অর্থ গ্রহণ করা সম্পূর্ণ ভুল। কেননা, কোনো পুরুষের জন্য এটি প্রশংসনীয় গুণ নয়। এটি অনেক বড় দোষ ও ত্রুটি। ফলে গবেষকগণ এই অর্থকে প্রত্যাখ্যান করেছেন। কাযি ইয়ায রহ. 'শিফা' গ্রন্থে এবং খাফাজি রহ. তার ব্যাখ্যাগ্রন্থ 'নসিমুর রিয়াদ'-এ এই অর্থ গ্রহণের কঠোর সমালোচনা করে সংখ্যাগরিষ্ঠ উলামায়ে কেরামের দৃষ্টিতে এটিকে ভ্রান্ত মত অভিহিত করেছেন।

পুরুষত্বশক্তি বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও তা নিয়ন্ত্রণ করার জন্য আল্লাহর মনোনীত বান্দাগণ সবসময় দুটি পদ্ধতির যেকোনো একটি অবলম্বন করতেন। একটি হলো, জনবিচ্ছিন্ন একাকীত্বের জীবন গ্রহণ করে, নিজের মনের বাসনাকে দমন করে, চরম আত্মসংযম ও আত্মনিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে চিরদিনের জন্য সেই পুরুষত্বশক্তিকে দমন করা। যেনো সেটিকে নিঃশেষ করে ফেলা। হযরত ঈসা আ.-এর জীবনে এ পদ্ধতি দেখা যায়। আর ইয়াহইয়া আ.-এর মাঝে মহান আল্লাহ এই তাঁকে গুণ কোনো ধরনের সাধনা বা সংযম ব্যতিরেকে সৃষ্টিগতভাবে দান করেছিলেন।

দ্বিতীয় পদ্ধতি হলো, সেটিকে নিয়ন্ত্রণের মধ্যে রাখা এবং তাকে দমন করার জন্য একটি সীমারেখো এঁকে দেওয়া যে, এক মুহূর্তের জন্যও অপাত্রমুখী হবে না। এমনকি অপাত্রমুখী হওয়ার আশঙ্কাও দানা বাঁধবে না। তবে মানববংশের ক্রমধারা অব্যাহত রাখার স্বার্থে সঠিক কার্যপন্থার মাধ্যমে দাম্পত্য জীবন গ্রহণ করবেন।

প্রথম পদ্ধতি যদিও আংশিক বিচারে প্রশংসনীয়, কিন্তু মানবপ্রকৃতি ও সামষ্টিক জীবনের বিবেচনায় এটি সঙ্গত নয়। কাজেই যেসকল নবী উল্লিখিত কার্যপদ্ধতি গ্রহণ করেছেন, তারা তাদের সময়ের অতীব গুরুত্বপূর্ণ চাহিদার দিকে তাকিয়ে তা গ্রহণ করেছেন। বিশেষকরে তাঁদের দাওয়াত বিশেষ বিশেষ জাতিতেই সীমিত ছিলো। কিন্তু সামাজিক জীবনের জন্য

প্রকৃতির মূল চাহিদা শুধু দ্বিতীয় পদ্ধতি অবলম্বন করলেই পূরণ হয়। এ কারণেই নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর শিক্ষা ও তাঁর ব্যক্তিগত কর্মপদ্ধতি এই দ্বিতীয় পন্থাকেই সমর্থন করে। কারণ তিনি ছিলেন বৈশ্বিক নবী। كَافَّةً لِلنَّاسِ : তথা সমগ্র বিশ্বের জন্য তিনি প্রেরিত হয়েছিলেন। তাঁর ধর্ম মানবপ্রকৃতির সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। সেখানে একমাত্র দ্বিতীয় পদ্ধতিই প্রাধান্য পাবে, প্রথমটি নয়। এ কারণে তিনি জীবনের নানাক্ষেত্রে তাঁর অনুসারীদের এ শিক্ষা দিয়েছেন যে, পৃথিবী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পাহাড়, জঙ্গল আর বন-বাদাড়ে যে ব্যক্তি জীবন কাটিয়ে দেয়, তার তুলনায় মহান আল্লাহর দরবারে ওই ব্যক্তির মর্যাদা বেশি, যে পার্থিব জীবনের নানা ব্যস্ততায় জড়িত থাকা সত্ত্বেও এক মুহূর্তের জন্য আল্লাহর নাফরমানি করে না। পদে পদে তাঁর নির্দেশ মান্য করে।

এরপর মহান আল্লাহ ইরশাদ করেছেন—

يَا يَحْيَى خُذِ الْكِتَابَ بِقُوَّةٍ وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا () وَحَنَانًا مِنْ لَدُنَّا وَزَكَاةً وَكَانَ تَقِيًّا () وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا () وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا ()

'হে ইয়াহইয়া, এ কিতাব দৃঢ়তার সঙ্গে গ্রহণ করো আমি তাকে শৈশবেই জ্ঞান দান করেছিলাম। এবং আমার নিকট হতে হৃদয়ের কোমলতা ও পবিত্রতা; সে ছিলো মুত্তাকি। পিতা-মাতার অনুগত এবং সে ছিলো না উদ্ধত ও অবাধ্য। তার প্রতি শান্তি যেদিন সে জন্ম লাভ করে, যেদিন তার মৃত্যু হবে এবং যেদিন সে জীবিত অবস্থায় উত্থিত হবে।' [সুরা মারইয়াম : আয়াত ১২-১৫]

পবিত্র কুরআন হযরত ইয়াহইয়া আ.-এর সৌভাগ্যময় জন্মের সুসংবাদ জানিয়েছে; কিন্তু এরপর তাঁর শৈশবে কী ঘটেছে? সে সম্পর্কে আলোচনা করে নি। কারণ কুরআনের উদ্দেশের সঙ্গে তার কোনো সম্পর্ক নেই। এরপর সে উল্লেখ করেছে যে, আল্লাহ হযরত ইয়াহইয়া আ.-কে নির্দেশ করলেন, 'তিনি যেনো দৃঢ়তার সঙ্গে তাওরাতের বিধানাবলির ওপর আমল করেন এবং সে মোতাবেক লোকদের হেদায়েত করেন'। কারণ হলো, হযরত ইয়াহইয়া আ. নবী ছিলেন, তিনি রাসুল ছিলেন না। ফলে তিনি ছিলেন তাওরাতে প্রদত্ত শরিয়তেরই অনুসারী। সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহ এ কথাও বলেছেন, তাঁর বাল্যবেলা ছিলো অন্যসব বালকদের থেকে আলাদা। মহান আল্লাহ তাঁকে বাল্যকালেই ইলম ও ফযিলত দান করেছিলেন। যাতে তিনি

দ্রুত নবুওতের পদবি অলঙ্কৃত করতে সমর্থ হন। সিরাতের কিতাবে রয়েছে যে, বাল্যবেলায় যখন অন্য ছেলেরা তাঁকে খেলাধুলার জন্য জোরাজুরি করতো, তখন তিনি উত্তর করতেন, 'খোদা আমাকে খেলা-ধূলার জন্য সৃষ্টি করেন নি'।[৪৫] সেখানে এ কথাও রয়েছে যে, তিনি ত্রিশ বছর বয়সে উপনীত হওয়ার পূর্বেই নবুয়ত লাভ করেছিলেন।[৪৬]

আলোচ্য আয়াতসমূহে وَ اٰتَيْنٰهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا এর এটাই অর্থ। যেমনটি মা'মার রহ. থেকে আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক রহ. নকল করেছেন।[৪৭] কেউ কেউ উল্লিখিত আয়াতের অর্থ করেছেন, হযরত ইয়াহইয়া আ.-কে শৈশবেই নবুয়ত দান করা হয়েছিলো। তাদের এ অর্থ সঠিক নয়। কেননা, নবুওতের মতো অতীব গুরুত্বপূর্ণ গুরুদায়িত্ব শৈশবেই প্রাপ্ত হওয়া বিবেকের বিচারেও যৌক্তিক নয়, এবং তা রেওয়ায়েতের মাধ্যমেও প্রমাণিত নয়।

উল্লিখিত আয়াতে আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে হযরত ইয়াহইয়া আ.-এর ওপর শান্তির যে দোয়া দেয়া হয়েছে, তাকে তিনটি সময়ের সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছে। বাস্তবতা হলো, মানবজীবনের জন্য ওই তিনটি মুহূর্তই সবচেয়ে বেশি নাজুক ও গুরুত্বপূর্ণ। জন্মের প্রাক্কালে, যখন সে মাতৃগর্ভ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পৃথিবীতে আসে। মৃত্যুর সময়, যার মাধ্যমে সে নশ্বর পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়ে কবরদেশে উপনীত হয়। পুনরুজ্জীবন ও পুনরুত্থানের সময়, যার মাধ্যমে সে কবরজগৎ থেকে আখেরাতে পাপ-পুণ্যের বিচারের সম্মুখীন হয়। এখন যদি কোনো ব্যক্তি আল্লাহর পক্ষ থেকে ওই তিন সময়ের জন্য শান্তির সুসংবাদ পেয়ে যায়, তাহলে প্রকৃতপ্রস্তাবে সে উভয় জাহানের মহাসৌভাগ্যের ভাণ্ডার পেয়ে গেলো।

সুরা আম্বিয়ায় ইরশাদ হয়েছে—

وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَى رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ () فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَى وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ ()

'এবং যাকারিয়ার কথা স্মরণ করুন, যখন সে তার পালনকর্তাকে আহ্বান করছিলো : হে আমার পালনকর্তা, আমাকে একা রেখো না। তুমি তো

---

[৪৫]. আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া : ২/৫০

[৪৬]. কাসাসুল আম্বিয়া লিন নাজ্জার : ৪২০

[৪৭]. তারিখে ইবনে কাসির, ২য় খণ্ড

উত্তম ওয়ারিস। অতঃপর আমি তার দোয়া কবুল করেছিলাম। তাকে দান করেছিলাম ইয়াহ্ইয়া এবং তার জন্য তার স্ত্রীকে প্রসবযোগ্য করেছিলাম। তারা সৎকর্মে প্রতিযোগিতা করতো, তারা আশা ও ভীতিসহ আমাকে ডাকতো এবং তারা ছিলো আমার কাছে বিনীত।' [সূরা আম্বিয়া : আয়াত ৮৯-৯০]

দীনের প্রচার ও প্রসার

মুসনাদে আহমদ, সুনানে তিরমিযি, ইবনে মাজাহসহ হাদিসের অন্যান্য কিতাবে হযরত হারেস আশআরি রা. থেকে বর্ণিত আছে, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, মহান আল্লাহ হযরত ইয়াহইয়া বিন যাকারিয়া আলাইহিমাস সালামকে বিশেষ ভাবে পাঁচ কাজের নির্দেশ করেছিলেন যে, এগুলোর ওপর তুমি নিজেও আমল করো এবং বনি ইসরাইলকেও শিক্ষা দাও। কিন্তু বিশেষ কারণে হযরত ইয়াহইয়া আ.-এর শিক্ষা কার্যক্রম শুরু করতে বিলম্ব হয়ে যায়। তখন হযরত ঈসা আ. বলেন, হে আমার ভাই, আপনি যদি সঙ্গত মনে করেন, তাহলে আমি বনি ইসরাইলকে ওই বিষয়গুলো শিক্ষা দান করি, যা সম্পন্ন করতে বিশেষ কারণে আপনার দেরি হয়ে যাচ্ছে। ইয়াহইয়া আ. বললেন, ভাই, আমি যদি তোমাকে অনুমতি দিয়ে দিই আর নিজেই নির্দেশ পালন না করি, তাহলে আমার আশঙ্কা হচ্ছে, এ কারণে আমার ওপর আযাব নেমে আসতে পারে বা আমি মাটির ভেতর ধসে যেতে পারি। কাজেই আমি-ই অগ্রসর হচ্ছি। তিনি বনি ইসরাইলকে বাইতুল মুকাদ্দাসে একত্র করলেন। যখন মসজিদ লোকারণ্য হয়ে গেলো, তখন তিনি নসিহত শুরু করলেন। যেখানে তিনি বলেন, আল্লাহ আমাকে পাঁচটি কাজের নির্দেশ করেছেন। যেগুলোর ওপর আমি নিজেও আমল করবো এবং তোমাদেরকেও শিক্ষা দেবো। সেই পাঁচটি আমলের বর্ণনা নিম্নরূপ :

১। প্রথম নির্দেশ হলো, আল্লাহ তাআলা ছাড়া অন্য কারো উপাসনা করবে না এবং কাউকে তাঁর সঙ্গে অংশীদার করবে না। কেননা, মুশরিকের উদাহরণ হলো ওই ব্যক্তির মতো, যাকে তার মনিব নিজ অর্থে ক্রয় করেছে। কিন্তু গোলামের অভ্যাস হলো, সে যা উপার্জন করে তা মনিবকে না দিয়ে অন্য কাউকে দিয়ে দেয়। তোমরাই বলো, তোমাদের কোনো ব্যক্তি কি তার গোলামের এই আচরণ পছন্দ করবে? এর থেকে বুঝে নাও, যখন প্রভু-ই তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন এবং তিনি-ই তোমাদেরকে রিযিক

দান করেন, তখন তোমরা শুধু তাঁর-ই উপাসনা করবে। তাঁর সঙ্গে কাউকে শরিক করবে না।

২। দ্বিতীয় নির্দেশ হলো, তোমরা বিনম্রতা ও সাধুতার সঙ্গে নামায আদায় করো। কেননা, যতক্ষণ তোমরা নামাযের ভেতর অন্য দিকে মনোযোগ না দেবে, মহান আল্লাহ অব্যাহতভাবে তোমাদের দিকে সন্তুষ্টি ও রহমতসহ মনোযোগী হয়ে থাকবেন।

৩। তৃতীয় নির্দেশ হলো, রোযা রাখো। কেননা, রোযাদারের উদাহরণ হলো ওই ব্যক্তি, যে একটি দলে অবস্থান করছে আর তার কাছে সুগন্ধির থলে রয়েছে। যার সৌরভ তাকেও সুরভিত করে এবং অন্য সঙ্গীদেরকেও মোহিত করে রাখে। রোযাদারের মুখের গন্ধের দিকে খেয়াল করবে না। কেননা, (পাকস্থলী শূন্য হওয়ার কারণে) রোযাদারের মুখে যে গন্ধ সৃষ্টি হয় তা আল্লাহর কাছে মিশকের সুগন্ধি অপেক্ষা অনেক পবিত্র।

৪। চতুর্থ নির্দেশ হলো, তোমাদের সম্পদ থেকে সদকা করো। কেননা, সদকাকারীর উদাহরণ ওই ব্যক্তির মতো, যাকে অকস্মাৎ শত্রুপক্ষ এসে পাকড়াও করেছে এবং তার হাত গলার সঙ্গে বেঁধে হত্যার স্থলে নিয়ে যাচ্ছে। তখন চরম নৈরাশ্যজনক অবস্থায় সে বললো, আমি যদি তোমাদেরকে সম্পদ দিয়ে আমার প্রাণ ছাড়িয়ে নিই, তাহলে কি তোমরা রাযি হবে? তাদের কাছ থেকে সে হ্যাঁবোধক উত্তর পেয়ে নিজের প্রাণের বিনিময়ে সমস্ত ধন-দৌলত উৎসর্গ করলো।

৫। পঞ্চম নির্দেশ হলো, দিনে-রাতে অধিক হারে আল্লাহর যিকির করে যাও। কেননা, যিকিরকারীর উদাহরণ হলো, এক ব্যক্তি শত্রুপক্ষ থেকে পলায়ন করছে। আর তারাও দ্রুততার সঙ্গে তার পেছনে ছুটছে। লোকটি তাদের কাছ থেকে পালিয়ে একটি কেল্লায় আশ্রয় নিয়ে নিজেকে শত্রুদের হাত থেকে রক্ষা করতে সমর্থ হলো। নিঃসন্দেহে আল্লাহর যিকির হলো সেই সুরক্ষিত কেল্লা; যেখানে কোনো মানুষ আশ্রয় নিলে সে তার চিরকালীন শত্রু শয়তান থেকে রক্ষা পেয়ে যায়।

এরপর নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবায়ে কেরামকে সম্বোধন করে বললেন, আমিও তোমাদেরকে সেই পাঁচটি কাজের নির্দেশ করছি, যা আল্লাহ আমাকে নির্দেশ করেছেন, অর্থাৎ 'মুসলমানদের জামাতকে আঁকড়ে ধরা' 'আমিরের কথা শোনা' ও 'তা মান্য করা' 'হিজরত করা' এবং 'আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করা'। কাজেই যে ব্যক্তি 'জামাত' থেকে এক বিঘৎ পরিমাণ বেরিয়ে গেলো সে ব্যক্তি নির্ঘাত নিজের গলা

থেকে ইসলামের রশি খুলে ফেললো। তবে সে ব্যক্তি এর থেকে রক্ষা পাবে যে জামাতের রজ্জু আঁকড়ে থাকবে। আর যে ব্যক্তি জাহেলি যুগের অনাচারের দিকে ডাকে, সে ব্যক্তির এর মাধ্যমে জাহান্নামে নিজের ঠিকানা গড়ে নেয়। হযরত হারেস আশআরি রা. বলেন, জনৈক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করলেন, যদি ওই ব্যক্তি নামায ও রোযা নিয়মিত পালন করে তবুও কি সে জাহান্নামের যোগ্য হবে? নবীজি বললেন, হ্যাঁ, যদিও সে নামায-রোযা নিয়মিত পালন করে আর নিজেকে মুসলমান মনে করে তবুও সে জাহান্নামেরই যোগ্য।[৪৮]

সিরাতলেখকগণ ইসরাইলি বর্ণনা থেকে নকল করে লিখেছেন যে, হযরত ইয়াহইয়া আ.-এর জীবনের বৃহৎ অংশ কেটেছে বন-বাদাড়ে। সেখানে তিনি নিঃসঙ্গ জীবন কাটাতেন। এসময় তিনি গাছের পাতা আর টিড্ডি খেয়ে দিনানিপাত করতেন। এমতবস্থায় তাঁর ওপর আল্লাহর বাণী অবতীর্ণ হয়। তখন তিনি জর্ডান নদীর তীরবর্তী এলাকাগুলোতে আল্লাহর দীন প্রচার করতেন এবং ঈসা আ.-এর আত্মপ্রকাশের সুসংবাদ প্রদান করতেন। লুকার ইঞ্জিলেও এর সমর্থন পাওয়া যায়—

> 'সেসময় জঙ্গলে যাকারিয়ার ছেলে ইউহান্নার ওপর খোদাওয়ান্দের বাণী নেমে এলো। তিনি জর্ডানের তীরবর্তী সমস্ত অঞ্চলে গিয়ে পাপ থেকে মার্জনা পেতে তওবার ব্যাপটিস্টার আহ্বান জানাতেন।'[৪৯]

ওয়াহাব বিন মুনাব্বিহ থেকে ইবনে আসাকির অনেকগুলো বর্ণনা নকল করেছেন। যার সারাংশ হলো, ইয়াহইয়া আ.-এর মাঝে খোদাভীতি এতটাই প্রবল ছিলো যে, তিনি সিংহভাগ সময় কাঁদতেন। এমনকি তাঁর উভয় গণ্ডদেশের ওপর অশ্রুর দাগ পড়ে গিয়েছিলো। একদিন তাঁর পিতা হযরত যাকারিয়া আ. যখন তাঁকে জঙ্গলে খুঁজে বের করলেন, তখন বললেন, প্রিয় বৎস আমার, আমরা তোমার কথা ভেবে অস্থির হয়ে তোমাকে খুঁজছি আর তুমি এখানে এসে চোখের জল ফেলে যাচ্ছো? উত্তরে ইয়াহইয়া আ. বললেন, হে পিতা, আপনি-ই তো আমাকে বলেছেন, জান্নাত ও জাহান্নামের মধ্যবর্তী স্থানে এমন একটি বিজন প্রান্তর রয়েছে, যা আল্লাহর ভয়ে অশ্রু বিসর্জন না করে পেরোনো যায় না। অথচ জান্নাতে যেতে হলে সেই প্রান্তর

---

৪৮. আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া : ২/৫২

৪৯. অধ্যায় : ১, আয়াত : ১

পেরোতে হয়। এ কথা শুনে হযরত যাকারিয়া আ.-এর চোখও অশ্রুসিক্ত হয়ে উঠলো।[৫০]

শাহাদাতের ঘটনা

হযরত ইয়াহইয়া আ. যখন আল্লাহর দীনের দিকে ডাকতে শুরু করলেন এবং লোকদের জানাতেন যে, আমার থেকে বড় আল্লাহর এক নবী শীঘ্রই আগমন করবেন তখন ইহুদিরা তার সঙ্গে শত্রু হয়ে গেলো। তাঁর মর্যাদা খোদাভীরুতা, জনপ্রিয়তা ও আহ্বান তাদের চক্ষুশূল হয়ে গেলো। একদিন তারা তাঁর কাছে একত্র হয়ে জিজ্ঞেস করলো, তুমি কি মসিহ? তিনি বললেন, না। তারা বললো, তুমি কি সেই নবী? তিনি বললেন, না। তারা বললো, তুমি কি ইলিয়া নবী? তিনি বললেন, না। তখন তারা সবাই সমস্বরে বললো, তাহলে তুমি কে যে, এভাবে প্রচার করছো এবং আমাদেরকে আহ্বান করছো। ইয়াহইয়া আ. বললেন, আমি অরণ্যে আহ্বানকারীর একটি ধ্বনি, যা সত্যের জন্য উচ্চকিত করা হয়েছে।[৫১] এ কথা শুনে ইহুদিরা ভীষণ ক্রুদ্ধ হলো এবং অবশেষে তাঁকে শহীদ করে ফেললো।

ইবনুল আসাকির المستقصى في فضائل الأقصى। [আল মুসতাকসা ফি ফাযায়িলিল আকসা] গ্রন্থে হযরত মুআবিয়া রা.-এর আযাদকৃত গোলাম কাসেম থেকে একটি দীর্ঘ বর্ণনা নকল করেছেন। যেখানে হযরত ইয়াহইয়া আ.-এর শাহাদাতের ঘটনা এভাবে বর্ণিত হয়েছে যে, দামেশকের রাজা হাদ্দাদ বিন হাদ্দার স্ত্রীকে তিন তালাক দিয়ে ফেলেছিলো। কিন্তু সে তাকে পুনরায় স্ত্রী হিসেবে পেতে চাইছিলো। ইয়াহইয়া আ.-এর কাছে ফতোয়া চাওয়া হলো। তিনি বললেন, এখন ও তোমার জন্য হারাম হয়ে গেছে। কথাটি রানির মনঃপূত হলো না। সে এর জন্য ইয়াহইয়া আ.-কে হত্যার দুরভিসন্ধি করলো। এর জন্য সে রাজাকে বাধ্য করে হত্যার অনুমতি নিয়ে ফেললো। হযরত ইয়াহইয়া আ. হিবরুন মসজিদে নামাযরত অবস্থায় ঘাতক মারফত হত্যা করলো। তৎপর সে একটি চিনামাটির পাত্রে তাঁর কর্তিত মস্তক নিয়ে আসার নির্দেশ করলো। কিন্তু হযরত ইয়াহইয়া আ.-এর দ্বিখণ্ডিত মুণ্ডু এ অবস্থাতেও এ কথাই বলে যাচ্ছিলো, তুমি রাজার জন্য

---

[৫০]. আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া : ২/৫২

[৫১]. ইঞ্জিল, ইউহান্না, অধ্যায় : ১, আয়াত : ১৯-২৮

হালাল নও। যতক্ষণ না তোমার অন্যত্র বিয়ে না হয়। এ অবস্থাতেই মহান আল্লাহর গযব নেমে এলো এবং সেই নারী মাথাসহ গোটা দেহ মাটির নিচে ধসে গেলো।

সেই বর্ণনায় এ ঘটনাও বর্ণিত রয়েছে যার কারণে গোটা বর্ণনাটিই অযৌক্তিক হয়ে পড়ে যে, হযরত ইয়াহইয়া আ.-এর দ্বিখণ্ডিত দেহ থেকে ফোয়ারার মতে রক্ত বেরোচ্ছিলো অব্যাহতভাবে। যখন বুখতেনাস্সার রাজা দামেশক জয় করে সেখানকার ৭০ হাজার ইসরাইলিকে হত্যা করে রক্তের নদী বইয়ে দেয়, তখনও সেই রক্তের ফিনকি বেরোচ্ছিলো। তখন হযরত ইয়ারমিয়াহ আ. এসে সেই রক্তকে সম্বোধন করে বলেন, হে রক্ত, তুমি কি এখনও প্রশান্ত হবে না? আল্লাহপাকের কত মাখলুক ধ্বংস হয়ে গেছে। এখন তুমি শান্ত হয়ে যাও। এ কথা শোনার পর সেই রক্তের স্রোত বন্ধ হয়।[৫২]

হাফেয ইবনে হাজার উল্লিখিত ঘটনাটি নকল করার পর বলেন, এই গল্পের আসল হলো, হাকেমের একটি রেওয়ায়েত, যা তিনি মুসতাদরাকে নকল করেছেন।

রেওয়ায়েতের সেই অংশটি যদি ইতিহাসের কোনো প্রাথমিক ছাত্রও শুনে তাহলে সে তা প্রত্যাখ্যান করতে দ্বিতীয়বার ভাববে না। কারণ হলো, এ কথা দিবালোকের মতো স্পষ্ট যে, হযরত ঈসা আ.-এর কয়েক শতাব্দী পূর্বে বুখতেনাস্সার অতিবাহিত হয়েছে। তাহলে ইয়াহইয়া আ.-এর ঘটনার সঙ্গে সেটিকে জোড় দেওয়া কীরূপে সঠিক হয়? আশ্চর্যের বিষয় হলো, হাফেয ইবনুল আসাকির ও হাফেয ইমাদুদ্দিন ইবনে কাসিরের মতো তীক্ষ্ণ সমালোচক কীভাবে সেটি নকল করার পর কোনো মন্তব্য করলেন না! দ্বিতীয় বিষয় হলো, উল্লিখিত রেওয়ায়েতে যে পরিমাণ বিস্ময়ভরা আশ্চর্যজনক একাধিক ব্যাপার এসেছে, তা সুস্পষ্ট 'নস' [অকাট্য বর্ণনা]-এর প্রমাণ ছাড়া গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। অথচ হাকেমের সেই বর্ণনাটি সনদ ও দিরায়াত [সনদের মান ও ভাষ্যে মান] উভয় মানদণ্ডেই আপত্তিজনক।

শাহাদাতের স্থল

হযরত ইয়াহইয়া আ.-কে কোন স্থান শহীদ করা হয়? ইতিহাস ও জীবনচরিত লেখকগণের মধ্যে বিষয়টি নিয়ে মতভেদ রয়েছে। একটি

---

[৫২]. আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া : ২/৫৫

অভিমত হলো, বাইতুল মুকাদ্দাসের ভেতর হায়কাল ও কুরবানীর স্থলের মধ্যবর্তী স্থানে হয়েছে। এখানে ৭০ হাজার নবীকে শহীদ করা হয়েছিলো। শামার বিন আতিয়্যাহ থেকে সুফয়ান সাওরি রহ. উল্লিখিত অভিমত নকল করেছেন।[৫৩]

হযরত সাঈদ ইবনুল মুসায়্যিব থেকে আবু ওবায়দাহ কাসিম বিন সাল্লাম নকল করেছেন যে, তাকে দামেশকে শহীদ করা হয়েছিলো। সেখানেই বুখতেনাস্সারের ঘটনাও সংঘটিত হয়েছিলো। ইবনে কাসির রহ. বলেন, এ অভিমত সহিহ হওয়ার জন্য আত্বা ও হাসান রহ.-এর সেই অভিমত স্বীকার করতে হবে, যেখানে তারা বলেছেন, বখতে নসর ঈসা আ.-এর সমকালীন ছিলো।[৫৪]

ইতোপূর্বে আমরা প্রমাণিত করেছি যে, নির্ভরযোগ্য ও বিশুদ্ধ ঐতিহাসিক সাক্ষ্যের আলোকে উল্লিখিত অভিমত ভুল। কেননা, হযরত ঈসা আ.-এর কয়েক শতাব্দী পূর্বে বখতে নসর অতিক্রান্ত হয়েছে। ব্যাপারটি খোদ ইবনে কাসির রহ. বাইতুল মুকাদ্দাসের ধ্বংসযজ্ঞ ও হযরত উযায়ের আ.-এর ঘটনায় স্বীকারও করেছেন। দ্বিতীয়ত যদি ওই অভিমত মেনে নেয়া হয়, তাহলে তার সঙ্গে সঙ্গে একথাগুলোও মেনে নিতে হবে যে, প্রথমত হযরত ঈসা আ. সর্বশেষ ইসরাইলি নবী নন। দ্বিতীয়ত নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর মধ্যে কোনো 'ওহির সাময়িক বিরতি'-এর সময়ও অতিবাহিত হয় নি। এ সময় আরমিয়াহ, হিযকিল, উযায়ের ও দানিয়াল আ. প্রমুখ ইসরাইলি নবী, যারা সর্বসম্মতিক্রমে বখতে নরস ও তৎপরবর্তীকালে 'বাবেল' নগরীতে বন্দী ছিলেন, তাদের প্রত্যেকে হযরত ঈসা আ.-এর পর আগমন করেছেন। অথচ এ দুটি দাবি তাওরাত, ঐতিহাসিক সাক্ষ্য ও ইসলামি রেওয়ায়েতের সামষ্টিক বর্ণনার সম্পূর্ণ পরিপন্থী। কাজেই তা ভুল ও প্রত্যাখ্যাত।

অবশ্য এতুটুক তথ্য –হযরত ইয়াহইয়া আ.-কে বাইতুল মুকাদ্দাসে নয়, বরং দামেশকে শহীদ করা হয়েছিলো– ইবনে আসাকিরের সেই রেওয়ায়েতের মাধ্যমেও সমর্থন পায় যা তিনি ওয়ালিদ বিন মুসলিমের সনদে নকল করেছেন যে, যায়দ বিন ওয়াকেদ বলেন, দামেশকে যখন সাকাসিকার স্তম্ভের নিচে একটি মসজিদ পুনর্নির্মাণ করা হয় তখন আমি নিজের চোখে দেখেছি যে, পূর্বদিকে মেহরাবের কাছে একটি পিলার খোদাই

[৫৩]. তারিখে ইবনে কাসির : ২/৫৫

[৫৪]. তারিখে ইবনে কাসির : ২/৫৫

করার সময় হযরত ইয়াহইয়া আ.-এর মাথা মুবারক বেরিয়ে আসে। গোটা চেহারা এমনকি চুলগুলো পর্যন্ত সতেজ দেখাচ্ছিলো। রক্তগুলো এতটাই টাটকা দেখাচ্ছিলো যে, মনে হয় তিনি সদ্য শহীদ হয়েছেন।[৫৫] কিন্তু এখানে একটি প্রশ্ন অবশ্যই সৃষ্টি হয় যে, তিনি কীভাবে নিশ্চিত হলেন, এটি হযরত ইয়াহইয়া আ.-এরই মুবারক মাথা। এটি অন্যকোনো নবী বা মহান ব্যক্তিরও তো হতে পারে।

মোটকথা, হযরত ইয়াহইয়া আ.-কে ঠিক কোথায় শহীদ করা হয়েছিলো? এ ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত জানানোর মতো সাক্ষ্য পাওয়া যায় না। তবে এতটুকু তথ্য সর্বমহল স্বীকৃত যে, ইহুদিরা তাঁকে শহীদ করেছিলো। যখন হযরত ঈসা আ. তাঁর শহীদ হওয়ার সংবাদ পান তখন তিনি প্রকাশ্যে দীনের দাওয়াত শুরু করেন।

পবিত্র কুরআন একাধিক স্থানে ইহুদিদের খুনে মানসিকতা, রক্তলোলুপতা ও বাতিলমুখী মনোবৃত্তির বিবরণ প্রদানকালে এ কথা বলেছে যে, তারা তাদের নবী-রাসূলদেরকে হত্যা করা থেকেও নিবৃত্ত হয় নি। সুরা আলে ইমরানে ইরশাদ হয়েছে—

إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ()

'নিশ্চয়ই যারা আল্লাহর আয়াত অস্বীকার করে, অন্যায়ভাবে নবীদের হত্যা করে এবং যারা ইনসাফের আদেশকারীদেরকেও হত্যা করে আপনি তাদেরকে মর্মন্তুদ শাস্তির সুসংবাদ জানিয়ে দিন।' [সুরা আলে ইমরান : আয়াত ২০]

ইবনে আবি হাতেম অবিচ্ছিন্ন সূত্রে হযরত আবু উবায়দা ইবনুল জাররাহ রা. থেকে বর্ণনা করেছেন, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, বনি ইসরাইল একদিনে ৪৩ নবী ও এমন ১৭০ জন মহৎ লোককে শহীদ করেছিলো, যাঁরা তাদেরকে সৎকাজের আদেশ করতেন।[৫৬]

যাকারিয়া আলাইহিস সালাম-এর ইন্তিকাল

হযরত ইয়াহইয়া আ.-এর শাহাদাত সংক্রান্ত আলোচনার অধীনে সিরাত ও ইতিহাস সংকলকগণ এ আলোচনাও করেছেন যে, তাঁর পিতা হযরত যাকারিয়া আ. কি স্বাভাবিকভাবে ইন্তিকাল করেছেন না-কি তাঁকেও শহীদ

[৫৫]. তারিখে ইবনে কাসির : ২/৫৫

[৫৬]. তাফসিরে ইবনে কাসির : ১/২৫৫

করা হয়েছিলো। এক্ষেত্রে উভয় মতই পাওয়া যায়। মজার বিষয় হলো, উভয় বর্ণনার সনদের উৎস ওয়াহাব বিন মুনাব্বিহ। ওয়াহাবের এক বর্ণনায় এসেছে, ইহুদিরা হযরত ইয়াহইয়া আ.-কে হত্যার পর যাকারিয়া আ.-এর দিকে খুনে মনোবৃত্তি নিয়ে ধাবিত হয়। তাদেরকে ছুটে আসতে দেখে হযরত যাকারিয়া আ. আত্মরক্ষার্থে পালিয়ে যান। এসময় তিনি সামনে একটি গাছ দেখতে পান। তিনি গাছটির ফোকরের ভেতর ঢুকে পড়েন। পশ্চাদ্ধাবনকারী ইহুদিরা তাকে সেখান থেকে বের না করে গাছের ওপর করাত চালিয়ে দেয়। যখন তাদের করাত হযরত যাকারিয়ার খুব কাছে চলে আসে তখন তার ওপর আল্লাহর ওহি অবতীর্ণ হয়। সেখানে তাকে বলা হয়, আপনি যদি সামান্যতম আর্তনাদ করেন, উহ্-আহ্ করেন তাহলে আমি এই পৃথিবী এখনই ধ্বংস করে ফেলবো। আর যদি আপনি ধৈর্য ধারণ করেন তাহলে আমিও এই ইহুদিদের ওপর এখনই আমার গযব নাযিল করবো না। হযরত যাকারিয়া আ. ধৈর্যধারণ করলেন। উহ শব্দটি পর্যন্ত করলেন না। ইহুদিরা গাছের সঙ্গে সঙ্গে তাঁকেও দ্বিখণ্ডিত করে ফেললো।[৫৭] সেই ওয়াহাব বিন মুনাব্বিহর অপর একটি বর্ণনায় এসেছে যে, গাছের ওপর করাত চালানোর ঘটনাটি হযরত শাইয়া আ.-এর সঙ্গে ঘটেছিলো। হযরত যাকারিয়া আ. শহীদ হন নি, তিনি স্বাভাবিকভাবে ইন্তিকাল করেছিলেন।[৫৮] মোটকথা, প্রসিদ্ধ অভিমত এটাই যে, তাঁকেও য়াহুদিরা শহীদ করেছিলো। তবে কোথায় কিভাবে শহীদ করা হয়েছিলো, সেসম্পর্কে বলার মতো কথা একটাই যে, আল্লাহই প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে সম্যক অবগত।

মিরাজ রজনীতে হযরত ইয়াহইয়া আ.

বুখারি রহ. হযরত ইয়াহইয়া আ.-এর আলোচনায় শুধু মি'রাজের হাদিসের ওই অংশটি নকল করেছেন, যেখানে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সঙ্গে তাঁর দ্বিতীয় আসমানে সাক্ষাৎ করার কথা এসেছে। বর্ণনায় এসেছে—

فلما خلصت فاذا يحيى وعيسى وهما ابنا خالة، قال : هذا يحيى وعيسى فسلم عليهما فسلمت فردا ثم قال : مرحبا بالاخ الصالح والنبي الصالح.

---

[৫৭] তাফসিরে ইবনে কাসির : ২/৫২

[৫৮]. তাফসিরে ইবনে কাসির : ২/৫২

'তৎপর যখন আমি দ্বিতীয় আকাশে পৌঁছি তখন দেখলাম, ইয়াহইয়া ও ঈসা আ. অবস্থান করছেন। তাঁরা পরস্পরে খালাতো ভাই। জিবরিল আ. আমাকে বললেন, এঁরা হলেন, ইয়াহইয়া ও ঈসা। তাদেরকে সালাম করুন। আমি সালাম নিবেদন করলাম। তাঁরা দু-জনের উত্তর করলেন এবং একসঙ্গে বললেন, স্বাগতম হে নেক ভাই ও হে মহান নবী।'

যাকারিয়া আ.-এর জীবনীতে এ কথা প্রমাণিত হয়েছে যে, ইয়াহইয়া আ.-এর জননী ঈশা [আল-ইয়াশা] ও মারইয়াম আলাইহাস সালামের জননী 'হান্নাহ' পরস্পরে সহদোরা বোন ছিলেন। মিরাজের হাদিসে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইয়াহইয়া ও ঈসা আ.-কে খালাতো ভাই বলেছিলেন প্রচলিত রূপক অর্থের ভিত্তিতে। সম্পর্কের ক্ষেত্রে এ ধরনের রূপক অর্থ গ্রহণের বিষয়টি ব্যাপকভাবে প্রচলিত। কেননা, মায়ের খালাকে সন্তানও খালা ডেকে থাকে।

আহলে কিতাবদের দৃষ্টিতে হযরত ইয়াহইয়া আ.

ইতোপূর্বে লুকার ইঞ্জিল থেকে আমরা ইয়াহইয়া আ. সম্পর্কে কয়েকটি উদ্ধৃতি নকল করেছি। আসল ঘটনা হলো, ইহুদিরা তাদের দুষ্ট মনোবৃত্তির ধারাবাহিকতা এখানেও অব্যাহত রেখেছে। সে মুতাবেক তারা তাকে নবী স্বীকার করে না। কিন্তু খ্রিস্টানরা তাকে শুধু 'ইয়াসু মাসিহের সংবাদবাহক' বলে স্বীকার করে এবং তার পিতা যাকারিয়া আ.-কে শুধু 'কাহিন' মেনে থাকে। আহলে কিতাব তাঁর নাম 'ইউহান্না' বলে। হতে পারে, 'ইয়াহইয়া'-এর অনুবাদ হিব্রু ভাষায় 'ইউহান্না' হবে অথবা হিব্রু ভাষার 'ইউহান্না' শব্দটি আরবিতে 'ইয়াহইয়া' উচ্চারণ ধারণ করেছে।

লুকার ইঞ্জিলেও পবিত্র কুরআনের এ কথার সমর্থন পাওয়া যায় যে, তাঁর পূর্বে তাঁর পরিবারের কারো এ নাম ছিলো না। এ কারণে পরিবারের লোকেরা এ নাম শুনে বিস্ময় প্রকাশ করেছে—

> 'আর অষ্টম দিনে লোকেরা শিশুটির খতনা করতে এসে তাঁর পিতার নামের অনুরূপ 'যাকারিয়া' নাম রাখলো। কিন্তু তার জননী বললেন, না, এ নাম নয়। বরং তার নাম ইউহান্না রাখা হোক। লোকেরা বললো, তোমার বংশে কারো তো এ নাম নেই। তখন তারা তাঁর পিতা যাকারিয়াকে ইশারায় বললো, আপনি শিশুটির কী নাম রাখতে ইচ্ছুক। তিনি একটি কাষ্ঠফলক আনতে বললেন। সেখানে তিনি লিখলেন, তার নাম ইউহান্না। সবাই বিস্মিত হয়ে পড়লো।

তৎক্ষণাৎ শিশুটির মুখ খুলে গেলো। সে কথা বলতে শুরু করলো এবং প্রথমে খোদাওয়ান্দের প্রশংসা করলো।'[৫৯]

তাঁর সাধারণ জীবন যাপন সম্পর্কে মাত্তার ইঞ্জিলে এসেছে—

'ইউহান্না উটের পশমের তৈরি পোষাক পরতেন। চর্মনির্মিত কোমরবন্ধনী কোমরে বাধতেন। তাঁর আহার ছিলো, টিড্ডি ও জংলি মধু।'[৬০]

তাঁর দীনের প্রচার ও প্রসার প্রসঙ্গে ইউহান্নার ইঞ্জিলে এসেছে—

'ইউহান্নার সাক্ষ্যের বিবরণ হলো, যখন ইহুদিরা জেরুজালেম থেকে 'কাহিন' ও 'লাওয়া' পাঠিয়ে তাদের মাধ্যমে তাঁকে জিজ্ঞেস করলো, তাহলে তুমি কে? তখন তিনি স্বীকার করলেন। অস্বীকার করলেন না। তিনি বরং স্বীকারোক্তি দিলেন, আমি তো মসিহ নই। তারা তাঁকে জিজ্ঞেস করলো, তাহলে তুমি কে? তুমি কি ইলিয়া? তিনি বললেন, আমি ইলিয়া নই। তারা জিজ্ঞেস করল, তুমি কি সেই নবী (অর্থাৎ সেই প্রতীক্ষিত নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)? তিনি বললেন, আমি তা নই। তৎপর তারা তাঁকে বললো, তাহলে তুমি কে? আমাদেরকে যারা পাঠিয়েছেন, তাদের কাছে আমরা যেনো উত্তর জানাতে পারি যে, তুমি নিজের সম্পর্কে কী দাবি করো। তিনি বললেন, আমার সম্পর্কে ইয়াসইয়াহ নবী বলেছেন, আমি জঙ্গলে আহ্বানকারীর সেই আওয়াজ যে, তোমরা খোদাওয়ান্দের পথ সোজা করো।'[৬১]

লুকার ইঞ্জিলে এ কথা এসেছে—

'সেসময় জঙ্গলে যাকারিয়ার ছেলে ইউহান্নার ওপর খোদাওয়ান্দের বাণী নেমে এলো। তিনি জর্ডানের তীরবর্তী সমস্ত অঞ্চলে গিয়ে পাপ থেকে মার্জনা পেতে ব্যাপটিস্টার আহ্বান জানাতেন। যেমনটি ইয়াসইয়াহ নবীর বাণীর পুস্তিকায় লেখা আছে যে, 'জঙ্গলের মাঝে চিৎকারকারীর এই চিৎকার আসছে যে, খোদাওয়ান্দের পথ তৈরি করো, তার রাস্তা সোজা করো।'[৬২]

---

[৫৯]. লূকা, . অধ্যায় : ১, আয়াত : ৫৯-৬৫

[৬০]. অধ্যায় : ৩, আয়াত : ৪-৫

[৬১]. অধ্যায় : ১, আয়াত : ১৯-২৩

[৬২]. লূকা, অধ্যায় : ৩, আয়াত : ২-৫

ওই ইঞ্জিলেই তাঁর গ্রেফতার সম্পর্কে এ কথা এসেছে—

'অতঃপর তিনি (ইউহান্না) আরো অনেক হিতোপদেশ করে লোকদেরকে সুসংবাদ জানাতেন। কিন্তু রাজ্যের চতুর্থাংশের নৃপতি হিরোদাস তার ভাই ফিলিপসের স্ত্রী হিরোদিয়াসের কারণে এবং তৎসংশ্লিষ্ট সেই সমস্ত অপকর্মের কারণে —যা হিরোদাস করেছিলো— যার কারণে ইউহান্না থেকে সে তিরস্কৃত হয়ে সবচেয়ে বড় এ অপরাধ করে ফেললো যে, সে তাঁকে বন্দী করে ফেললো।'[৬৩]

সেই ইঞ্জিলেই কিছুদূর পরে তাঁর শাহাদাত সম্পর্কে বলা হয়েছে—

'রাজ্যের চতুর্থাংশের নৃপতি হিরোদেস সমস্ত কথা শুনে ঘাবড়ে গেলো। কেননা, কেউ বলছিলো, ইউহান্না মৃতদের মাঝ থেকে জীবিত হয়ে এসেছে। কেউ বলছিলো, ইলিয়া নবী আত্মপ্রকাশ করেছেন। কেউ বলছিলো, প্রাচীনকালের কোনো এক নবী পুনর্জীবিত হয়েছেন। কিন্তু হিরোদেশ বললো, আমি তো ইউহান্নার শিরশ্ছেদ করেছি। এখন এই মাসিহ আবার কে? যার সম্পর্কে এ জাতীয় কথাবার্তা শুনছি?'[৬৪]

শিক্ষা ও উপদেশ

হযরত যাকারিয়া ও ইয়াহইয়া আলাইহিস সালামে জীবনী ও ঘটনাপ্রবাহ থেকে খুব সহজেই বিভিন্ন শিক্ষা ও উপদেশ গ্রহণ করা যায়। তার মধ্যে নিম্নের কয়েকটি শিক্ষা মনোযোগ আকর্ষণ করে।

১। পৃথিবীতে ওই ব্যক্তি থেকে নরাধম ও দুর্ভাগা আর কেউ নেই, যে এমন মহান ব্যক্তিকে হত্যা করে, যে তাকে কোনো কষ্ট দেয় নি, কখনো তার ধন-সম্পদের ওপর হস্তক্ষেপ করে নি। বরং উল্টো কোনো ধরনের পারিশ্রমিক ও বিনিময় ব্যতিরেকে তাঁর জীবনকে সুন্দর ও অর্থবহ করে তুলতে সর্বপ্রকার সেবা দিয়ে যায় এবং তাকে চরিত্র, কর্মকাণ্ড ও আকিদাগত এমন বিশ্বাস শিক্ষা দেয়, যা তার দুনিয়া ও আখেরাতের প্রভূত কল্যাণ ও সৌভাগ্য বয়ে আনে। হযরত আবু উবায়দাহ ইবনুল জাররাহ রা. একবার প্রশ্ন করেছিলেন, কিয়ামতের সবচেয়ে বেশি কোন লোকটি আযাবের হকদার

---

[৬৩]. অধ্যায় : ৩, আয়াত : ১৮-১৯

[৬৪]. অধ্যায় : ৯, আয়াত : ৭-৯

হবে? তার উত্তরে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ ইরশাদ করেন—

قال : رجل قتل نبيًا أو من أمر بالعروف ونهي عن المنكر.

'ওই ব্যক্তি যে কোনো নবীকে অথবা এমন ব্যক্তিকে হত্যা করেছে যে তাকে সৎ কাজের আদেশ করতো এবং অসৎ কাজ নিষেধ করতো।'

পৃথিবীর সকল জাতিসমূহের মধ্যে ইহুদি জাতিই সেই চরম নিকৃষ্ট অপকর্মের হোতা। তারা যুগে যুগে তাদের নবী-রাসুলদের সঙ্গে যে ধরনের মন্দ আচরণ করেছে, বিদ্রূপ করেছে, গায়ে হাত তুলেছে এমনকি নবী হত্যার মতো জঘন্য কাজ অবলীলায় করে ফেলতে পেরেছে, তার দৃষ্টান্ত অন্যকোনো জাতিতে নেই।

২। বনি ইসরাইলে অনেকগুলো শাখাগোত্র ছিলো। ফলে তাদের জনপদে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পৃথক শাসনব্যবস্থা হতো। যার ফলে একই সময় তাদের উদ্দেশে একাধিক নবী প্রেরিত হতেন। তবে তাদের সবার শিক্ষার একটাই বুনিয়াদ হতো। সেটি হলো, তাওরাত। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর পক্ষে তাঁর উম্মতের মধ্যে 'উলামায়ে কেরাম'-এর যে অবস্থান, হযরত মুসা আ.-এর পক্ষে তাদের অবস্থান হতো তারই অনুরূপ। যদিও علماء امتي كانبياء بني اسرائيل হাদিসটির প্রামাণ্যতা শাব্দিক বিবেচনায় বিশ্লেষণের অপেক্ষা রাখে, কিন্তু ভাষ্য ও মর্মের বিচারে সেটি শতভাগ বিশুদ্ধ ও যথার্থ। কারণ হলো, সর্বশেষ নবীর আগমনের মাধ্যমে নবুওতের ধারাবাহিকতা চূড়ান্ত পূর্ণতায় পৌঁছে সমাপ্তি ঘটেছে, কাজেই অনুকম্পাপ্রার্থী এই উম্মতের কিয়ামত পর্যন্ত ইসলাহ ও হেদায়েতের জন্য 'উলামায়ে হক' ছাড়া দ্বিতীয় কোনো জামাত হতে পারে না। কাজেই তাঁরা নবুওতের উত্তরাধিকারের অভিজাত পদবিতে সেভাবে অধিষ্ঠান পেয়েছেন, হযরত মুসা আ.-এর শিক্ষার প্রচার-প্রসারের কাজে যে পদবিতে বনি ইসরাইলি নবীগণ অধিষ্ঠিত হতেন।

এখানে আমরা 'আলেম' শব্দের সঙ্গে 'হক' শব্দ যুক্ত করেছি বিশেষ কারণে। তা হলো, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম 'উলামায়ে সু' [মন্দ আলেমকুল]-কে নিকৃষ্টতম সৃষ্টি ঘোষণা করেছেন। কাজেই উলামায়ে সূ [মন্দ আলেমকুল]-এর আনুগত্য উম্মতের শুধু গুমরাহিকেই ডেকে আনে না, বরং বরবাদি নিশ্চিত করে। কারণ, উলামায়ে সূ-এর কারণে 'উলামায়ে হক'-এর বিরুদ্ধেও জনমনে খারাপ ধারণা ছড়াতে থাকে।

ফলে তাঁদের বিরুদ্ধে বিদ্রূপ ও উপহাসের পরিবেশ তৈরি করার মাধ্যমে একটি প্রতিষ্ঠিত ধর্মকে ধ্বংস করার আয়োজন চূড়ান্ত করা হয়। তখন উম্মতের বৃহৎ একটি গোষ্ঠী কোন শ্রেণির আলেম হক আর কোন শ্রেণির আলেম সু? তা তারা কুরআন-হাদিসের কষ্টিপাথর দিয়ে যাচাই না করে নিজস্ব অভিরুচি ও মতাদর্শের সঙ্গে সামাঞ্জস্যের মানদণ্ডে বাছ-বিচার করতে শুরু করে।

উপরন্তু বিশেষ ব্যক্তি বা সদস্যের বিরোধিতার আবেগে উদ্বেলিত হয়ে সাধারণত 'উলামায়ে দীন'-কে তিরস্কারের টার্গেট বানানো হয়ে থাকে। অথচ তাদের অসম্মান ও অপমান করাটা প্রকৃত বিচারে 'দীনে হক'-এর শিক্ষার বিরুদ্ধে 'বিদ্রোহের পতাকা' বুলন্দ করার নামান্তর। যারা একাজ করবে, তারা সেই ইহুদিদের উত্তরাধিকারী হবে, যাদের কথা সুরা আলে ইমরানের ২০ নং আয়াতে বলা হয়েছে।

৩। আল্লাহর দয়া ও করুণা থেকে কারো কখনো নিরাশ হওয়া উচিত হবে না। কখনো এমনও হতে পারে যে, ইখলাসের সঙ্গে দোয়া করা সত্ত্বেও উদ্দেশ্য সাধিত হচ্ছে না; আদৌ এর অর্থ এ নয় যে, ওই ব্যক্তির ওপর থেকে আল্লাহর রহমতের দৃষ্টি উঠে গেছে। কেননা, আল্লাহ হচ্ছেন সর্বশ্রেষ্ঠ প্রজ্ঞাবান। তাঁর দৃষ্টিতে কখনও কখনও এটাও ধরা পড়ে যে, একজন ব্যক্তি যে জিনিসকে তার নিজের জন্য কল্যাণ মনে করে উঠে-পড়ে চাচ্ছে, তা পরিণতি ও ফলাফলের বিচারে তার জন্য চূড়ান্ত ক্ষতিকর হবে। অথচ সে তার সীমিত জ্ঞানের কারণে বিষয়টি এ মুহূর্তে বুঝতে পারছে না। অথবা প্রার্থিত জিনিসটির অবতরণে বিলম্ব ঘটলে তা ব্যক্তিবিশেষের কল্যাণের স্থলে গোটা গোষ্ঠীর জন্য কল্যাণকর হবে, যার কারণে আল্লাহই তার বিলম্ব চাচ্ছেন। অথবা তার চেয়েও উত্তম উদ্দেশ্যের জন্য এটিকে কুরবান করে দেয়া হয়। এমন অনেক প্রজ্ঞা ও কল্যাণ অন্তরালে থেকে যায়। যা মানবচোখে গোচরীভূত হয় না। কাজেই শেষ কথা হলো, নৈরাশ্য ও হতাশা আল্লাহর দরবারে অত্যন্ত অপ্রিয় ও অপছন্দনীয়। ইরশাদ হয়েছে—

وَلَا تَيْأَسُوا مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ

'আর আল্লাহর আশিষ হতে তোমরা নিরাশ হয়ো না। কারণ কাফির সম্প্রদায় ব্যতীত অন্য কেউ আল্লাহর আশিষ হতে নিরাশ হয় না।' [সুরা ইউসুফ : আয়াত ৮৭]

আসহাবুল জান্নাহ

সুরা আল-ক্বালাম এবং আসহাবুল জান্নাহ

আল্লাহ তাআলা সুরা আল-ক্বালামে মক্কার কাফেরদের অবস্থা অনুসারে একটি দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, বাগানের মালিকেরা যেভাবে আল্লাহর নেয়ামতকে পাছে ঠেলেছে, নেয়ামতের হক আদায় করার জন্য তার কৃতজ্ঞতা করে নি, মক্কার মুশরিকদের অবস্থাও তা-ই। আল্লাহ তাআলা খাতিমুন নাবিয়্যিন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে তাদের মধ্যে নবীরূপে প্রেরণ করে তাদের ওপর তাঁর নেয়ামতের পূর্ণ প্রকাশ ঘটিয়েছেন। তাদের পথ প্রদর্শন ও হেদায়েতের জন্য মহান পথপ্রদর্শক পাঠিয়ে তাদের প্রতি মহাঅনুগ্রহ করেছেন। কিন্তু তারা এই নেয়ামত ও অনুগ্রহের কোনো মর্যাদা দেয় নি। তারা অস্বীকার ও বিরোধিতার সঙ্গে ওই নেয়ামতকে প্রত্যাখ্যান করেছে। সুতরাং তাদের পরিণাম তা-ই হলো, যা হয়েছিলো বাগানের মালিকদের।

আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেছেন—

إِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ إِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ () وَلَا يَسْتَثْنُونَ () فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِنْ رَبِّكَ وَهُمْ نَائِمُونَ () فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ () فَتَنَادَوْا مُصْبِحِينَ () أَنِ اغْدُوا عَلَى حَرْثِكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَارِمِينَ () فَانْطَلَقُوا وَهُمْ يَتَخَافَتُونَ () أَنْ لَا يَدْخُلَنَّهَا الْيَوْمَ عَلَيْكُمْ مِسْكِينٌ () وَغَدَوْا عَلَى حَرْدٍ قَادِرِينَ () فَلَمَّا رَأَوْهَا قَالُوا إِنَّا لَضَالُّونَ () بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ () قَالَ أَوْسَطُهُمْ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ لَوْلَا تُسَبِّحُونَ () قَالُوا سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ () فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَلَاوَمُونَ () قَالُوا يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا طَاغِينَ () عَسَى رَبُّنَا أَنْ يُبْدِلَنَا خَيْرًا مِنْهَا إِنَّا إِلَى رَبِّنَا رَاغِبُونَ () كَذَلِكَ الْعَذَابُ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ (سورة القلم)

'আমি তাদেরকে (মক্কার মুশরিকদেরকে) পরীক্ষা করেছি যেভাবে পরীক্ষা করেছিলাম উদ্যানের অধিপতিগণকে, যখন তারা শপথ করেছিলো যে, তারা

প্রত্যুষে আহরণ করবে বাগানের ফল, এবং তারা 'ইনশাআল্লাহ' বলে নি। এরপর তোমার প্রতিপালকের কাছ থেকে এক বিপর্যয় হানা দিলো সেই উদ্যানে, যখন তারা ছিলো নিদ্রামগ্ন। ফলে তা দগ্ধ হয়ে কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করলো। (আল্লাহর আযাবের ফলে তাদের ওই বাগান বিনষ্ট ও ধ্বংস হয়ে গেলো।) প্রত্যুষে তারা একে অপরকে ডেকে বললো, 'তোমরা যদি ফল আহরণ করতে চাও তবে সকাল সকাল বাগানে চলো।' এরপর তারা চললো নিম্নস্বরে কথা বলতে বলতে, (তাড়াতাড়ি করো,) 'আজ যেনো কোনো অভাবগ্রস্ত ব্যক্তি বাগানে তোমাদের কাছে প্রবেশ করতে না পারে।' তারপর তারা (অভাবগ্রস্তদের) নিবৃত্ত করতে সক্ষম—এই বিশ্বাস নিয়ে তারা সকালে বাগানে যাত্রা করলো। যখন তারা বাগানের অবস্থা দেখলো, বললো, 'আমরা তো দিশা হারিয়ে ফেলেছি। বরং আমরা তো বঞ্চিত।' তাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি বললো, 'আমি কি তোমাদেরকে বলি নি? এখনো তোমরা আল্লাহর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করছো না কেনো?' (এই ধ্বংসাত্মক পরিণাম লক্ষ করে) তারা তখন বললো, 'আমরা আমাদের প্রতিপালকের পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করছি, আমরা তো সীমালঙ্ঘনকারী ছিলাম।' এরপর তারা একে অপরের প্রতি দোষারোপ করতে লাগলো (যে, তুমি কেনো আগে আমাকে এ-ব্যাপারে বুঝালে না)। তারা বললো, 'হায় দুর্ভোগ আমাদের! আমরা তো ছিলাম সীমালঙ্ঘনকারী। সম্ভবত আমাদের প্রতিপালক আমাদেরকে এর চেয়ে উৎকৃষ্টতর বিনিময় দেবেন; আমরা আমাদের প্রতিপালকের অভিমুখী হলাম।' শাস্তি এমনই হয়ে থাকে এবং আখেরাতের শাস্তি কঠিনতর। যদি তারা জানতো!' [সুরা আল-ক্বালাম : আয়াত ১৭-৩৩]

ঘটনা সম্পর্কে বিভিন্ন বক্তব্য

হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস রা. বলেন, এখানে পবিত্র কুরআন মক্কার কাফেরদের অবস্থা অনুসারে একটি দৃষ্টান্ত উপস্থিত করেছে। এটা বাস্তব কোনো ঘটনা নয়।[৬৫]

হযরত সাঈদ বিন জুবায়ের রা. বলেন, এটি বাস্তব ঘটনা। এই ঘটনা ইয়ামানের দারওয়ান নামক জনপদে সংঘটিত হয়েছিলো। দারওয়ান ইয়ামানের রাজধানী সানআ থেকে ছয় মাইল দূরে অবস্থিত। মুফাস্‌সিরগণ এই ঘটনার বিস্তারিত বর্ণনা দিয়েছেন—

[৬৫] তাফসিরে ইবনে কাসির, সুরা আল-ক্বালাম।

আহলে কিতাবিদের মধ্যে এক ব্যক্তি সম্পদশালী, বিপুল ভূ-সম্পত্তির মালিক ও সৎ ব্যক্তি ছিলেন। তাঁর জমিনে উৎপন্ন শস্য থেকে গরিব-মিসকিনদেরকে যথেষ্ট দান করতেন। তিনি তাঁর কয়েকজন পুত্রকে উত্তরাধিকারী রেখে মৃত্যুবরণ করলেন। জমিনের শস্য ও বাগানের ফল কেটে আনার সময় হলো। তখন ওই ব্যক্তির উত্তরাধিকারী পুত্রেরা পরস্পর বলাবলি করতে লাগলো, আমার বাবা ছিলেন বড় নির্বোধ। তিনি তার বিরাট সম্পদ ফকির-মিসকিনদেরকে বিলিয়ে দিতেন। আমরা তাঁর মতো পাগল নই। আমরা আমাদের পরিশ্রমকে এভাবে নিষ্ফল হতে দেবো না। তাদের মধ্যে এই সিদ্ধান্ত হলো, তোমরা জমিনের ফসল ও বাগানের ফল কাটার জন্য ভোরের অন্ধকার থাকতে থাকতেই চলো। আর দ্রুত ফসল ও ফল কাটো, যাতে গরিব-মিসকিনরা জানতেও না পারে। ওরা জেনে গেলে ক্ষেতে ও বাগানে এসে আমাদের ত্যক্ত-বিরক্ত করবে।

এই হাড়-কৃপণেরা আল্লাহর প্রতি কোনো ভয়ই করলো না। তারা আল্লাহর প্রতি ভয়শূন্য হয়ে এই পরামর্শ করছিলো যে, সমস্ত সম্পদ পুঞ্জীভূত করে ধন-ভাণ্ডার প্রতিষ্ঠা করবে। ধন-ভাণ্ডার থেকে তারা আল্লাহর হকও আদায় করবে না, আল্লাহর বান্দা গরিব-মিসকিনেরও হক আদায় করবে না। কিন্তু ওদিকে আল্লাহ তাআলার নির্দেশে রাতের মধ্যেই প্রচণ্ড ও উত্তপ্ত বায়ু এসে তাদের শস্যে ভরপুর ফসলি জমিন ও ফলজ বাগান পুড়ে ছাই-ভস্ম করে দিলো। তারা পরামর্শ অনুসারে ভোরের অন্ধকার থাকতে থাকতেই ওখানে পৌঁছে অন্য রকম ব্যাপার দেখতে পেলো এবং কিছুই বুঝতে পারলো না। তারা আরো সামনের দিকে এগিয়ে গেলো এবং মনে করলো সম্ভবত এগুলো তাদের জায়গা-জমিন নয়। কিন্তু অন্যান্য চিহ্ন ও আলামত দেখে তারা চমকে উঠলো। তখনই তারা বুঝতে পারলো যে, এটা তাদের কৃপণতা ও কুপরামর্শের পরিণাম ছাড়া কিছু নয়; গত রাতে তারা গরিব ও মিসকিন লোকদের বিরুদ্ধে তাদের হক নষ্ট করার জন্য এই পরামর্শ করেছিলো। তখন তারা আফসোস ও আক্ষেপের সঙ্গে তাদের দুর্ভাগ্যের অভিযোগ করতে শুরু করলো। আল্লাহ তাআলাকে ডাকতে শুরু করলো। কিন্তু সময় তো চলে গেছে এবং তারা তাদের কৃতকর্মের পরিণামও ভোগ করছে। এখন তাদের এই চিৎকার নিষ্ফল ও ব্যর্থ প্রমাণিত হলো।

ব্যাখ্যা

এটি দৃষ্টান্ত হোক বা বাস্তব ঘটনা হোক, পবিত্র কুরআনের তা বর্ণনা করার মধ্যে উপদেশ প্রদান ও ভীতি প্রদর্শনের যে-বিষয়টি নিহিত রয়েছে তা

সর্বাবস্থায় তার জায়গায় থাকবে। কেননা, আগের আয়াতগুলোতে মক্কার কুরাইশদের অবাধ্যতা এবং রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নবুয়তকে অবিশ্বাস ও অস্বীকার করার কথা আলোচনা করা হয়েছে। বিশেষভাবে তাদের সরদার ওয়ালিদ বিন মুগিরার কুকর্মসমূহের উল্লেখ করা হয়েছে। এরপর তাদের উদ্দেশে একটি দৃষ্টান্ত পেশ করা হয়েছে বা একটি বাস্তব ঘটনা শোনানো হয়েছে। এভাবে তাদেরকে বলা হচ্ছে যে, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং আল্লাহ তাআলার নেয়ামতের (কুরআনের) বিরুদ্ধে পারস্পরিক সলা-পরামর্শ করা, কুরআনের শিক্ষা—আল্লাহ তাআলার হক ও তাঁর বান্দাদের হক আদায় করা, থেকে দূরে সরে যাওয়া, নিজেদের শক্তি ও প্রতাপের জন্য গর্ব ও অহমিকা প্রদর্শন করা এবং নিষ্পাপ নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং মুসলমাদের হেয় প্রতিপন্ন করার পরিণাম তাই হবে, যা বাগানের অধিপতিদের হয়েছিলো। তা এ-কারণে যে, আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে অবকাশ প্রদানের যে-নীতি রয়েছে, তা ঔদ্ধত্য প্রদর্শনকারীদের অবকাশ দিয়ে থাকে এবং অবস্থা সংশোধনের জন্য সুযোগ দিয়ে থাকে। কিন্তু যখন কোনো জাতি সেই সুযোগ ও অবকাশকে কাজে লাগায় না; বরং আল্লাহর প্রদত্ত অবকাশকে বাতিলের পূজার পক্ষে সত্যতার দলিল হিসেবে উপস্থিত করে, সত্যপরায়ণদেরক ও তাদের সত্যতাকে হেয় ও অপদস্থ করার জন্য উদ্যত হয়, তখন আল্লাহর শাস্তির বিধান তার কঠিন পাঞ্জায় তাদের ঘাড় চেপে ধরে এবং তাদেরকে ধ্বংস ও মূলোৎপাটিত করে দিয়ে বিশ্ববাসীর জন্য উপদেশ ও শিক্ষা গ্রহণের উপকরণ বানিয়ে দেয়। তখন আক্ষেপ-আহাজারি কোনো ফল বয়ে আনে না, অনুতাপ-হাহাকার কোনো কাজে আসে না। এমনকি সেই মুহূর্তে ঈমান আনাও তাদের কোনো উপকার করতে পারে না। আল্লাহ তাআলার অনুগত ও একনিষ্ঠ হওয়ার ঘোষণাও তাদের কোনো কল্যাণ করতে পারে না।

আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে বলেছেন—

وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا

'আমি যখন কোনো জনপদ ধ্বংস করতে চাই তখন তার সমৃদ্ধিশালী ব্যক্তিদেরকে সৎকাজ করতে আদেশ করি (নবীগণকে ওহির মাধ্যমে সত্যের পয়গাম পৌঁছে দিই); কিন্তু তারা সেখানে অসৎকর্ম করে; ফলে তার

(জনপদের) প্রতি দণ্ডাজ্ঞা ন্যায়সঙ্গত হয়ে যায় এবং আমি (কৃতকর্মের পরিণামে) তা সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত করি।' [সুরা বনি ইসরাইল : আয়াত ১৭]

উপদেশ

আল্লাহ তাআলা এই অস্তিত্বের জগতে মানবজাতিকে সমষ্টিগতভাবে জীবনযাপনের উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করেছেন। মানবজীবনের এক-একটি প্রয়োজন অন্য প্রয়োজনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। ফলে মানবজাতির এই কারখানা পারস্পরিক অংশগ্রহণ ও সহযোগিতা ব্যতীত চলতে পারে না। বিভিন্ন শ্রেণির ব্যক্তির সমন্বয়ে সামষ্টিক জীবনের কাঠামো তৈরি হয় এবং একটি শৃঙ্খলার মধ্য দিয়ে তা অতিবাহিত হয়। ফলে মানবজাতির জীবনের স্থায়িত্ব এবং ক্রমশ অগ্রসরমানতার জন্য নীতিমালা ও শৃঙ্খলা নির্ধারিত হওয়া অতি আবশ্যক। যাতে এই নীতিমালা ও শৃঙ্খলার অধীনে মানবজাতির সদস্যদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব ও বন্ধুত্ব প্রতিষ্ঠিত হতে পারে এবং কখনো হিংসা-বিদ্বেষ ও শক্রতার উৎপত্তি না হয়। আল্লাহ তাআলা এই শৃঙ্খলার পূর্ণতার জন্য সামাজিক জীবনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট দু-ধরনের অধিকার নির্ধারণ করেছেন— একটি জীবনযাপনের অধিকার এবং দ্বিতীয়টি জীবনযাপনের স্তরসমূহের অধিকার।

জীবনযাপনের অধিকারের বিধান হলো, এই সৃষ্টিজগতে একটি প্রাণীও এমন থাকবে না যা জীবনের অধিকার থেকে বঞ্চিত হবে। এটি প্রত্যেক প্রাণী, প্রত্যেক মানুষের ব্যক্তিগত অধিকার যে, সে জীবিত থাকবে। জীবনে বেঁচে থাকার অধিকারের ক্ষেত্রে ইহলোকে সবাই সমান; এই অধিকারের ক্ষেত্রে কেউ কারো থেকে শ্রেষ্ঠত্ব ও উচ্চতার অধিকারী নয়।

দ্বিতীয়টি হলো জীবনযাপনের স্তরসমূহের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অধিকারের বিধান : অর্থাৎ, এটা আবশ্যক যে, সামাজিক জীবনে প্রত্যেকেই তার অধিকার প্রাপ্য হবে; কিন্তু একইসঙ্গে সবার সমান অধিকার প্রাপ্য হওয়া আবশ্যক নয়। কেননা, আল্লাহ তাআলা কুরআনে বলেছেন—

وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ

'আল্লাহ জীবনোপকরণে তোমাদের কাউকে কারো ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন।' [সুরা নাহল : আয়াত ৭১]

কিন্তু সামাজিক জীবনে জীবিকার বেশ-কম ও স্তরের ভিন্নতার অর্থ এই নয় যে, একজন ব্যক্তি যা-কিছু উপার্জন করবে তার সবকিছু ব্যক্তিগতভাবে তাঁরই অধিকারে থাকবে। বরং যে-ব্যক্তি যতটুকু অধিক উপার্জন করবে,

সেই পরিমাণ সম্পদে সামগ্রিক অধিকার অধিক হবে। অর্থাৎ, অধিক উপার্জনের ক্ষেত্রে সামগ্রিক অধিকার সমানুপাতিক হারে সাব্যস্ত হবে। সামাগ্রিক অধিকার আবার দুই ভাগে বিভক্ত : হক্কুল্লাহ— আল্লাহর হক বা অধিকার এবং হক্কুল ইবাদ— বান্দার হক বা অধিকার। সুতরাং, যে-ব্যক্তি তার ধন-সম্পদকে কেবল ব্যক্তিগত অধিকার ও মালিকানা মনে করে এবং তাতে আল্লাহর অধিকার ও অন্য মানুষের অধিকারকে অস্বীকার করে এবং সম্পদের নেশায় মজে গিয়ে আল্লাহ তাআলার বিধি-বিধানের পরোয়া করে না, তার পরিণাম কখনো কল্যাণকর হয় না। সে আল্লাহ তাআলার অসন্তুষ্টি ও শাস্তির উপযুক্ত বিবেচিত হয়। আল্লাহ তাআলা বলেন

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ (سورة التوبة)

'হে মুমিনগণ, পণ্ডিত এবং সংসারবিরাগীদের মধ্যে অনেকেই মানুষের সম্পদ অন্যায়ভাবে ভোগ করে থাকে এবং মানুষকে আল্লাহর পথ থেকে নিবৃত্ত করে। আর যারা স্বর্ণ-রৌপ্য পূঞ্জীভূত করে এবং তা আল্লাহর পথে ব্যয় করে না তাদেরকে মর্মন্তুদ শাস্তির সংবাদ দাও।' [সুরা তওবা : আয়াত ৩৪]

ওয়ালিদ বিন মুগিরা ও কুরাইশ বংশীয় নেতৃবৃন্দকে আল্লাহ তাআলা সব ধরনের নেয়ামত দান করেছিলেন। পার্থিব বস্তুগত উন্নতি ও ঐশ্বর্য প্রদানের সঙ্গে সঙ্গে খাতিমুল আম্বিয়া হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে প্রেরণ করে তাদের জন্য আধ্যাত্মিক নেয়ামতকেও পূর্ণ করে দিয়েছিলেন। কিন্তু এই দুর্ভাগার দল এসব নেয়ামতের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার পরিবর্তে অকৃজ্ঞত হয়েছে। অবশেষে পরিণাম এই দাঁড়িয়েছে যে, যেভাবে বাগানের অধিপতিরা তাদের বাগানের নেয়ামতসমূহ থেকে বঞ্চিত হয়েছিলো তেমনি মুশরিকেরাও পার্থিব ও আধ্যাত্মিক নেয়ামতসমূহ থেকে বঞ্চিত হয়ে অপমানিত ও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ

'সুতরাং, হে বুদ্ধিমান ও জ্ঞানীগণ, তোমরা উপদেশ গ্রহণ করো।'

মুমিন ও কাফের

সুরা কাহ্ফ এবং মুমিন ও কাফেরের ঘটনা

আল্লাহ তাআলা সুরা কাহ্ফে গুহাবাসীদের ঘটনা বর্ণনা করার পর আরো একটি ঘটনার উল্লেখ করেছেন। ঘটনাটি দুজন মানুষের মধ্যে বিতর্কমূলক কথোপকথনের আকারে উল্লেখ করা হয়েছে এবং সঙ্গে সঙ্গে এই ঘটনার পরিণতি ও ফলও বর্ণিত হয়েছে। অর্থাৎ, একজনের জীবন পরিণামের বিবেচনায় সফলকাম হয়েছে এবং আরেকজনের জীবনকে অনুতাপ ও হাহাকারের মুখ দেখতে হয়েছে।

এই ঘটনার ব্যাপারে কতিপয় মুফাস্সিরের ধারণা এই যে, পবিত্র কুরআন মক্কার কাফের ও মুসলাম দল দুটির অবস্থাকে সামনে রেখে উপদেশ গ্রহণ ও নসিহতের জন্য এই ঘটনাকে দৃষ্টান্ত হিসেবে বর্ণনা করেছে। বিষয় এই নয় যে, এই ধরনের ঘটনা বাস্তবে দুজন মানুষের (মুমিন ও কাফেরের) মধ্যে কোনো অতীতকালে সংঘটিত হয়েছিলো।

আল্লামা ইমাদুদ্দিন বিন কাসির বলেন, জমহুর মুফাস্সিগণের বক্তব্য এই যে, যেভাবে গুহাবাসীদের ঘটনা সংঘটিত হয়েছে, তেমনি পবিত্র কুরআন অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে দুজন মানুষের মধ্যেও এই ঘটনা সংঘটিত হয়েছিলো। আর পবিত্র কুরআন এই দুটি ঘটনাকে মক্কার মুশরিকদের জন্য উপদেশ গ্রহণ ও সতর্ক করার জন্য বর্ণনা করেছে।

পবিত্র কুরআন যে-পদ্ধতিতে দুজন ব্যক্তির এই ঘটনাকে উল্লেখ করেছে, হাদিসের কিতাব এবং সিরাত ও ইতিহাসের গ্রন্থগুলোতে তার চেয়ে বেশি কিছু বর্ণিত হয় নি। সুতরাং পবিত্র কুরআনে বর্ণিত ঘটনাই পাঠযোগ্য—

وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا رَجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا () كِلْتَا الْجَنَّتَيْنِ آتَتْ أُكُلَهَا وَلَمْ تَظْلِمْ مِنْهُ شَيْئًا وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهَرًا () وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا وَأَعَزُّ نَفَرًا () وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ قَالَ مَا أَظُنُّ أَنْ تَبِيدَ هَٰذِهِ أَبَدًا () وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِنْ رُدِدْتُ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنْقَلَبًا () قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ

وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَكَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ سَوَّاكَ رَجُلًا () لَكِنَّا هُوَ اللَّهُ رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِرَبِّي أَحَدًا () وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مَالًا وَوَلَدًا () فَعَسَى رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَنِ خَيْرًا مِنْ جَنَّتِكَ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِنَ السَّمَاءِ فَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا () أَوْ يُصْبِحَ مَاؤُهَا غَوْرًا فَلَنْ تَسْتَطِيعَ لَهُ طَلَبًا () وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَا أَنْفَقَ فِيهَا وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا () وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مُنْتَصِرًا () هُنَالِكَ الْوَلَايَةُ لِلَّهِ الْحَقِّ هُوَ خَيْرٌ ثَوَابًا وَخَيْرٌ عُقْبًا (سورة الكهف)

'(হে নবী,) তুমি তাদের কাছে পেশ করে দুই ব্যক্তির উপমা : আমি তাদের একজনকে দিয়েছিলাম দুটি আঙ্গুর-বাগান এবং এই দুটিকে আমি খেজুর গাছ দ্বারা পরিবেষ্টিত করেছিলাম এবং এই দুইয়ের মধ্যবর্তী স্থানকে করেছিলাম শস্যক্ষেত্র। উভয় বাগানই ফলদান করতো এবং তাতে কোনো ত্রুটি করতো না আর উভয়ের ফাঁকে ফাঁকে প্রবাহিত করেছিলাম নহর। এবং তার প্রচুর ধন-সম্পদ ছিলো। কথাপ্রসঙ্গে সে (একদিন গর্বের সঙ্গে) তার বন্ধুকে (যে সচ্ছল ছিলো না) বললো, 'ধন-সম্পদে আমি তোমার থেকে শ্রেষ্ঠ এবং জনবলে তোমার থেকে শক্তিশালী।' এইভাবে নিজের প্রতি জুলম করে সে তার বাগানে প্রবেশ করলো। সে বললো, 'আমি মনে করি না যে, এই বাগান কখনো ধ্বংস হয়ে যাবে; আমি মনে করি না যে, কিয়ামত হবে, আর আমি যদি আমার প্রতিপালকের কাছে প্রত্যাবৃত্ত হই-ই তবে (আমার আর চিন্তা কিসের?) আমি তো (সেখানে) নিশ্চয় এই বাগানের চেয়ে উৎকৃষ্ট স্থান পাবো।' তার জবাবে তার বন্ধু তাকে বললো, 'তুমি কি তাঁকে অস্বীকার করছো যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন মাটি থেকে ও পরে শুক্র থেকে এবং তারপর পূর্ণাঙ্গ করেছেন মনুষ্য আকৃতিতে? কিন্তু তিনিই আল্লাহ, আমার প্রতিপালক এবং আমি কাউকেও আমার প্রতিপালকের সঙ্গে শরিক করি না। তুমি যখন তোমার বাগানে প্রবেশ করলে তখন (তার ফলের প্রাচুর্য ও সতেজতা দেখে) কেনো বললে না, আল্লাহ যা চান তাই হয়, আল্লাহর সাহায্য ব্যতীত কোনো শক্তি নেই? তুমি যদি ধনে ও সন্তানে আমাকে তোমার চেয়ে নিকৃষ্টতর মনে করো[তবে (এতে গর্বিত হয়ো না,) হয়তো আমার প্রতিপালক আমাকে তোমার

বাগানের চেয়ে উৎকৃষ্টতর কিছু দেবেন এবং তোমার বাগানে আকাশ থেকে নির্ধারিত বিপর্যয় প্রেরণ করবেন, যার ফলে তা উদ্ভিদশূন্য প্রান্তরে পরিণত হবে। অথবা তার পানি ভূগর্ভে অন্তর্হিত হবে এবং তুমি কখনো তার সন্ধান লাভে সক্ষম হবে না।' তার ফল-সম্পদ বিপর্যয়ে বেষ্টিত হয়ে গেলো (ফলে সব বিনষ্ট হয়ে গেলো) এবং সে তাতে যা ব্যয় করেছিলো তার জন্য আক্ষেপ করতে লাগলো যখন তা মাচাসহ ভূমিসাৎ হয়ে গেলো। সে বলতে লাগলো, 'হায়, আমি যদি কাউকেও আমার প্রতিপালকের সঙ্গে শরিক না করতাম!' আর আল্লাহ ব্যতীত তাকে সাহায্য করার জন্য কোনো লোকজন ছিলো না এবং সে নিজেও প্রতিকারে সমর্থ হলো না। এই ক্ষেত্রে কর্তৃত্ব আল্লাহরই যিনি সত্য। পুরস্কার দানে ও পরিণাম নির্ধারণে তিনিই শ্রেষ্ঠ।' [সুরা কাহ্ফ : আয়াত ৩২-৪৪]

এ ঘটনার ব্যাখ্যা

এই আয়াতগুলোর পূর্বে এ-কথা উল্লেখ করা হয়েছে যে, যে-ব্যক্তি আল্লাহর নেয়ামতকে অস্বীকার করে ও কাফের, তার জন্য রয়েছে জাহান্নামের আগুন। আর যাঁরা মুমিন, এক আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস রাখে, তাদের জন্য রয়েছে সব ধরনের আনন্দময় জীবনোপকরণ ও চিরস্থায়ী উদ্যান (জান্নাত)। এরপর আলোচ্য আয়াতগুলোতে এ-কথা বলা যেতে পারে যে, যারা কাফের, আল্লাহকে অবিশ্বাসকারী, তারা কেবল আখেরাতের নেয়ামত থেকেই বঞ্চিত নয়; বরং তারা দুনিয়াতেও অচিরকালের মধ্যেই নানা ধরনের ব্যর্থতা, অকৃতকার্যতা ও দুর্ভাগ্যের শিকার হবে। তাদের এই গর্ব ও অহমিকা– তারা সব ধরনের বিলাসী জীবনোপকরণ ও সুখকর সচ্ছলতার অধিকারী এবং তারা বিপুল ধন ও ঐশ্বর্যের অধিপতি এবং তাদের লোকবলও অত্যন্ত শক্তিশালী—অচিরেই মাটির সঙ্গে মিশে যাবে। আর মুমিনদের উদ্দেশে বলা হচ্ছে যে, তারা যেনো তাদের বর্তমান সঙ্কটময় ও সংকীর্ণ অবস্থার জন্য ব্যথিত না হয়, মর্মযাতনায় না ভোগে। কেননা, অচিরেই এমন সময় আসবে যখন তাদের এই নিঃস্ব অবস্থা সব ধরনের সম্মান ও শক্তিতে রূপান্তরিত হবে। আর পার্থিব শান্তিময় জীবন তো একটি চলমান শিবির; এর ওপর ভরসা করে থাকা নিষ্ফল। যখন এই জীবনের সমাপ্তির সময় চলে আসে তখন এক মুহূর্তের জন্যও বিলম্ব হয় না। পৃথিবীর কোনো শক্তিই তাকে রক্ষা করতে পারে না।

এই বাস্তবতাকে স্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করার জন্যই পবিত্র কুরআন উল্লিখিত দৃষ্টান্ত উপস্থিত করেছে : মনে করো, কোনো এলাকায় দুজন মানুষ ছিলো।

তাদের একজনকে আল্লাহ তাআলা পার্থিব জীবনের ও সুখ-সাচ্ছন্দ্যের সমস্ত উপকরণ দিয়েছিলেন। আর তাদের আরেকজন ছিলো নিঃস্ব ও সঙ্কটময় অবস্থায়। প্রথমজন আল্লাহ তাআলাকে অস্বীকার করতো এবং ধন-সম্পদের নেশায় চুর ছিলো। সে তার দরিদ্র বন্ধুকে অহমিকা ও ঔদ্ধত্যের সঙ্গে বলতো, আমার এসব ধন ও ঐশ্বর্য চিরস্থায়ী হবে; কোনো শক্তিই নেই এগুলোকে আমার থেকে ছিনিয়ে নেয়। আর তার বন্ধু তো দরিদ্রতা ও সঙ্কটময় অবস্থায় দিনতিপাত করছিলো। তার দরিদ্র বন্ধু যদিও দুর্দশাগ্রস্ত ছিলো, কিন্তু সে আল্লাহ তাআলার সত্যিকারের বান্দা ছিলো। সে তার দাম্ভিক বন্ধুর কথার জবাবে বলতো, তুমি সম্পদের অহমিকায় মত্ত হয়ে এতটা বাড়াবাড়ি করো না। কেউ-ই জানে না যে এক মুহূর্তের মধ্যে কী ঘটে যেতে পারে। আর কে জানে, আল্লাহপাক হয়ত একদিন আমাকেও এসব নেয়ামতে ও সম্পদে সমৃদ্ধ করবেন, যার জন্য তুমি আজ অহমিকা প্রকাশ করছো।

অবশেষে এই পরিণামই ঘটলো। যে-বাগানের ফল-প্রাচুর্য, সজীবতা ও সুগন্ধের প্রথম ব্যক্তি অহমিকা প্রকাশ করতো, অকস্মাৎ তা জ্বলে-পুড়ে ভস্মীভূত হয়ে গেলো। গতকাল যেখানে ফুলে ও ফলে শোভিত সুরভিত উদ্যান ছিলো, সেখানে আজ ধ্বংস ও বিনাশের চিহ্ন ছাড়া কিছুই অবশিষ্ট নেই।

এই দৃষ্টান্তে আল্লাহ তাআলা মক্কার মুশরিক ও মুসলমান দল দুটির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট চিত্র অঙ্কন করেছেন। যা ছিলো তৎকালীন আরবের পরিবেশ ও প্রতিবেশের যথার্থ প্রতিরূপ। কেননা, ওখানে মুসলমানদের তার থেকে বড় কোনো সম্পদ ছিলে না যে, উৎকৃষ্ট থেকে উৎকৃষ্টতর আঙ্গুরের বাগান এবং তার চারপাশে বিস্তৃত খেজুর গাছের ঘন সারি; বাগানের মধ্য দিয়ে প্রবহমান নহর এবং নহরের চারপাশে ফুলে ও ফলে শোভিত শস্যক্ষেত্র। এসবকিছুই ছিলো মক্কার মুশরিকদের করায়ত্ত। আর মক্কার মুসলিম সম্পদায় তখন এসব পার্থিব নেয়ামত ও ধন-সম্পদ থেকে বঞ্চিত ছিলো।

যাইহোক। এটা কোনো বাস্তব ঘটনা হোক বা দৃষ্টান্তই হোক. উপদেশ প্রদান ও সতর্ক করার যে-উদ্দেশ্যে তা বর্ণনা করা হয়েছে, তার প্রেক্ষিতে ঘটনাটি মক্কার মুশরিক ও মুসলমানদের পারস্পরিক বৈপরীত্যের ঘনিষ্ঠ ও পূর্ণাঙ্গ চিত্রকে অঙ্কন করেছে।

মক্কার কুরাইশদের অহমিকা ও দম্ভের এই অবস্থা ছিলো যে, তারা শুরুতে হেদায়েতের পয়গামের প্রতি কর্ণপাতই করলো না। আর কখনো যদি তা

শোনার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করতো, তখন এই শর্ত জুড়ে দিতো যে, যতক্ষণ আমরা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কাছে বসে থাকবো ততক্ষণ পর্যন্ত হীন অবস্থাপীড়িত মুসলমানদের কেউ আমাদের কাছাকাছি স্থানে বসতে পারবে না। কেননা, তাদের সঙ্গে বসা আমাদের জন্য অত্যন্ত অপমানকর। তারা মনে করতো যে, তাদের ধন-সম্পদ ও বিলাসিতা অবিনশ্বর এবং তাদের প্রতাপ ও প্রতিপত্তি চিরস্থায়ী। এ-কারণে তারা মুসলমানদের দরিদ্র ও দুর্বল দেখে তাদের নিয়ে ঠাট্টা-তামাশা ও বিদ্রূপ করতো এবং তুচ্ছ ও হেয় জ্ঞান করতো।

পবিত্র কুরআন সূক্ষ্ম ও অলৌকিক পদ্ধতিতে মুসলমানদের দুরবস্থার সময়ে পরিণামের বিচারে তাদের সফলতা ও মুশরিকদের বিফলতার সংবাদ দিলো। যা অচিরকালের মধ্যেই ঘটবার ছিলো। ফলে পুণ্যবান আত্মাসমূহ এই দৃষ্টান্তের তাৎপর্য বুঝতে পারলো এবং নিজেদেরকে সত্যের কোলে সোপর্দ করলো। আর যারা ছিলো অশুভ আত্মা এবং যাদের দুর্ভাগ্যের ওপর সীলমোহর পড়ে গিয়েছিলো, কিছুকাল পরেই তারা পরিতাপ ও হাহাকারভরা পরিণামের শিকার হলো। তাদের ব্যাপারে কেবল এতটুকুই বলা যেতে পারে—

خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ ذَٰلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ

'সে ক্ষতিগ্রস্ত হয় দুনিয়া ও আখেরাতে; এটাই তো সুস্পষ্ট ক্ষতি।' [সূরা হজ : আয়াত ১১]

শাহ আবদুল কাদির রহ. উপরিউক্ত আয়াতগুলোর তাফসিরে বলেন—

> 'প্রাচীনকালে একজন ধনবান ব্যক্তি মৃত্যুমুখে পতিত হলো। তার দুজন ছেলে ছিলো। তারা পৈত্রিকসূত্রে প্রাপ্ত সব সম্পদ বণ্টন করে নিলো। দুই ভাইয়ের একজন সব সম্পদ ক্রয় করে নিজের মালিকানায় নিয়ে নিলো। দুই দিকে ফলের বাগান রোপণ করলো। মধ্যস্থলে খাল কেটে তার মাটি দুই পাশের বাগানে এনে ফেললো। উদ্দেশ্য এই যে, খরার সময়েও যেনো বাগান দুটি ক্ষতিগ্রস্ত না হয়। সে আবার উচ্চ বংশে বিয়ে করলো। সন্তান-সন্ততি হলো। চাকর-বাকর রাখলো। পার্থিব জীবনযাপনের সুব্যবস্থা করে মহা আনন্দের সঙ্গে দিনতিপাত করতে লাগলো। অপর দিকে তার ভাই সমস্ত সম্পদ আল্লাহর রাস্তার দান করে দিয়ে আল্লাহর ওপর ভরসা করে বসে রইলো।'[৬৬]

---

[৬৬] মুযিহুল কুরআন।

জানি না, হযরত শাহ সাহেব (নাওওয়ারাল্লাহু মারকাদাহু) ঘটনাটির এই বিস্তারিত বিবরণ কোথা থেকে সংগ্রহ করেছেন। হাদিস, সিরাত ও ইতিহাসের কিতাবসমূহ এ-ব্যাপারে নীরব রয়েছে। 'আমার ছোট মুখে বড় কথা শোভা পায় না', হযরত শাহ সাহেব তাঁর বর্ণিত ঘটনায় যেভাবে দুইজনের মধ্যে বিপরীত অবস্থা প্রকাশ করেছেন, পবিত্র কুরআনের বাহ্যিক বর্ণনা তার সমর্থন করে না। কেননা, মুমিন ব্যক্তি কাফের ব্যক্তির অহমিকা ও দম্ভের যে-জবাব দিয়েছে এবং কাফের ব্যক্তি মুমিন ব্যক্তির দরিদ্রতার কারণে যে-তিরস্কার করেছে তা কখনো এই অবস্থার উপযোগী নয় যে, মুমিন ব্যক্তি বাস্তবেই সমৃদ্ধিশালী ছিলো; কিন্তু সে তার সমস্ত সম্পদ আল্লাহর পথে ব্যয় করে দিয়েছিলো। বাস্তবে যদি এমনটাই হতো, তাহলে মুমিন ব্যক্তি ও কাফের ব্যক্তির কথোপকথনের ধারা ভিন্ন রকম হতো। والله تعالى أعلم بالصواب, আল্লাহ তাআলাই ভালো জানেন।

শিক্ষণীয় বিষয়

১. পার্থিব ধন-সম্পদ হলো দুই মুহূর্তের খুশবুবিশেষ এবং চারদিনের চাঁদের আলো;ক্ষণস্থায়ী ও ধ্বংসশীল। সুতরাং, বুদ্ধিমান ব্যক্তি তিনিই যিনি ধন-সম্পদের জন্য গর্ব ও অহমিকা প্রকাশ করেন না এবং সম্পদের মদে চুর হয়ে আল্লাহ তাআলার অবাধ্যাচরণের জন্য উদ্যত হয় না। তিনি ইতিহাসের ওই পৃষ্ঠাগুলোর প্রতি সবসময় লক্ষ রাখেন যাতে ফেরআউন, নমরুদ, সামুদ ও আদের মতো শক্তিমত্তায় গর্বিত জাতিগুলোর পরিণাম আজো লিপিবদ্ধ রয়েছে। এই মর্মে আল্লাহ তাআলা বলেছেন—

سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ (سورة النمل)

'বলো, 'পৃথিবীতে পরিভ্রমণ করো এবং দেখো অপরাধীদের পরিণাম কেমন হয়েছে।' [সুরা নাম্ল : আয়াত ৭০]

২. সত্যিকারের সম্মান আল্লাহ তাআলার প্রতি ঈমান ও সৎকাজের মধ্য দিয়েই অর্জিত হয়। পার্থিব ধন-সম্পদ ও প্রতাপ-প্রতিপত্তির দ্বারা তা অর্জিত হয় না। মক্কার কুরাইশদের ধন-সম্পদ ও প্রতাপ-প্রতিপত্তি দুটোই ছিলো; কিন্তু বদরের যুদ্ধে তাদের শোচনীয় পরিণাম এবং ধর্মীয় ও পার্থিব অপমান ও লাঞ্ছনা কেউ-ই ঠেকিয়ে রাখতে পারে নি। মুসলমানগণ পার্থিব সব ধরনের জীবনোপকরণ থেকে বঞ্চিত ছিলেন;

কিন্তু আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস ও সৎকর্ম যখন তাদের ধর্মীয় ও পার্থিব সম্মান ও প্রতাপ দান করলো, তখন তার সামনে কেউ-ই প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়াতে পারলো না। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তাআলা ঘোষণা করেছেন—

وَلِلّٰهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُوْلِهٖ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ وَلٰكِنَّ الْمُنَافِقِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ (سورة المنافقون)

'শক্তি তো আল্লাহরই, আর তাঁর রাসুল ও মুমিনদের। তবে মুনাফিকরা তা জানে না।' [সুরা মুনাফিকুন : আয়াত ৮]

৩. মুমিন ব্যক্তিদের শান এই যে, যদি আল্লাহ তাআলা তাঁকে দুনিয়ার নেয়ামতে সমৃদ্ধিশালী করেন, তবে তাঁরা দম্ভ ও অহমিকা প্রকাশের পরিবর্তে আল্লাহ তাআলার দরবারে বিনয়ের সঙ্গে মস্তক অবনত করে নেয়ামতের স্বীকৃতি জ্ঞাপন করেন। অন্তর ও জবান দিয়ে স্বীকার করেন, হে আল্লাহ, আপনি যদি আমাকে এই ধন-সম্পদ না দিতেন, তবে তা অর্জন করা আমার ক্ষমতা ও শক্তির বাইরে ছিলো। এসবকিছুই আপনার দান ও বদান্যতার সদকা।

আলোচ্য ঘটনায় মুমিন ব্যক্তি কাফের ব্যক্তিকে এ-পরামর্শই দিয়েছিলো—

وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللّٰهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ

'তুমি যখন তোমার বাগানে প্রবেশ করলে তখন কেনো বললে না, আল্লাহ যা চান তাই হয়, আল্লাহর সাহায্য ব্যতীত কোনো শক্তি নেই?' [সুরা কাহ্ফ : আয়াত ৩৯]

সহিহে হাদিসে রয়েছে, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—

الكنز من كنوز الجنة لا حول و لا قوة إلا بالله

'জান্নাতের ভাণ্ডারসমূহ থেকে একটি ভাণ্ডার এই যে, সৎকাজের শক্তি এবং খারাপ কাজ থেকে বেঁচে থাকার ক্ষমতা অর্জন করা আল্লাহর সাহায্য ব্যতীত সম্ভব নয়।'

অর্থাৎ, যে-ব্যক্তি মুখে এ-কথা স্বীকার করে এবং অন্তরে এই সত্যকে দৃঢ়মূল করে, সে যেনো বেহেশতের অদৃশ্য ভাণ্ডারসমূহের চাবি হস্তগত করেছে।

পক্ষান্তরে কাফেরের অবস্থা এমন : পার্থিব ও ধন-সম্পদ ও মান-মর্যাদা তার আয়ত্তে চলে এলে সে অহমিকায় উদ্ধত হয়ে ওঠে। আল্লাহর

কোনো সৎ বান্দা তাকে যখন বুঝায় যে, এসব আল্লাহ তাআলার দান, তাঁর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করো, তখন সে গর্বের সঙ্গে বলে ওঠে—

إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ عِندِي

'এই সম্পদ আমি আমার জ্ঞানবলে প্রাপ্ত হয়েছি।'[৬৭] এই ধন-সম্পদ ও মান-মর্যাদা আল্লাহর প্রদত্ত নয়।

ফলে, মুমিন ও কাফেরের জন্য আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে দু-ধরনের জবাব পাওয়া যায়। তা সুরা মুমিনুনের নিম্নলিখিত আয়াতে বর্ণিত হয়েছে—

أَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُم بِهِ مِن مَّالٍ وَبَنِينَ () نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ بَل لَّا يَشْعُرُونَ () إِنَّ الَّذِينَ هُم مِّنْ خَشْيَةِ رَبِّهِم مُّشْفِقُونَ () وَالَّذِينَ هُم بِآيَاتِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ () وَالَّذِينَ هُم بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ () وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوا وَّقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ () أُولَئِكَ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ (سورة المؤمنون)

'তারা কি মনে করে যে, আমি তাদেরকে সাহায্য হিসেবে যে-ধন-ঐশ্বর্য ও সন্তান-সন্ততি দান করি, তার দ্বারা তাদের জন্য সব ধরনের কল্যাণ ত্বরান্বিত করছি? না, তারা বুঝে না (যে, তাদের প্রকৃত অবস্থা ভিন্নরূপ; আল্লাহ তাআলার বিধান এখানে কার্যকরী রয়েছে)। নিশ্চয় যারা তাদের প্রতিপালকের ভয়ে সন্ত্রস্ত, যারা তাদের প্রতিপালকের নিদর্শনাবলিতে ঈমান আনে, যারা তাদের প্রতিপালকের সঙ্গে শরিক করে না, এবং যারা তাদের প্রতিপালকের কাছে ফিরে যাবে এই বিশ্বাসে তাদের যা দান করার তা দান করে ভীত-কম্পিত হৃদয়ে, তারাই দ্রুত সম্পাদন করে কল্যাণকর কাজ এবং তারা তাতে অগ্রগামী হয়।' [সুরা মুমিনুন : আয়াত ৫৫-৬১]

৪. ভাগ্যবান ব্যক্তি তিনিই, যিনি পরিণাম আসার আগেই পরিণামের প্রকৃত অবস্থা চিন্তা করে এবং অবশেষে চিরস্থায়ী সৌভাগ্য লাভ করে। আরে ওই ব্যক্তি দুর্ভাগা, যে পরিণাম চিন্তা না করে প্রথমেই গর্ব ও অহমিকা প্রকাশ করে, তারপর তার ভয়াবহ পরিণাম দর্শন করে অনুতাপ ও

---

[৬৭] সুরা কাসাস : আয়াত ৭৮।

হাহাকার করে। অথচ তার অনুতাপ ও হাহাকার কোনো কাজে আসে না। যেমন : আলোচ্য বাস্তব ঘটনায় বা দৃষ্টান্তে কাফের ব্যক্তি এমন দুর্ভাগ্যেরই শিকার হয়েছে। এ-বিষয়ে পবিত্র কুরআন বলছে—

وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَا أَنْفَقَ فِيهَا وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا (سورة الكهف)

'তার ফল-সম্পদ বিপর্যয়ে বেষ্টিত হয়ে গেলো এবং সে তাতে যা ব্যয় করেছিলো তার জন্য আক্ষেপ করতে লাগলো যখন তা মাচাসহ ভূমিসাৎ হয়ে গেলো। সে বলতে লাগলো, 'হায়, আমি যদি কাউকেও আমার প্রতিপালকের সঙ্গে শরিক না করতাম!' [সুরা কাহ্ফ : আয়াত ৪২]

আর ফেরআউনকেও এমন দুর্ভাগ্যময় দিনের শিকার হতে হয়েছিলো। সময় চলে যাওয়ার পর সেও এ-কথাই বলেছিলো। আযাব প্রত্যক্ষ করার আগেই যদি সে হযরত মুসা আ.-এর কথা মেনে নিতো, তবে এই মর্মন্তুদ শাস্তিতে পতিত হতে হতো না। যেমন : পবিত্র কুরআনে বর্ণনা করা হয়েছে—

وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيًا وَعَدْوًا حَتَّى إِذَا أَدْرَكَهُ الْغَرَقُ قَالَ آمَنْتُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا الَّذِي آمَنَتْ بِهِ بَنُو إِسْرَائِيلَ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ () آلْآنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ (سورة يونس)

'আমি বনি ইসরাইলকে সমুদ্র পার করালাম এবং ফেরআউন ও তার সৈন্যবাহিনী ঔদ্ধত্যসহ সীমালঙ্ঘন করে তাদের পশ্চাদ্‌ধাবন করলো। অবশেষে যখন সে নিমজ্জমান হলো তখন বললো, 'আমি বিশ্বাস করলাম বনি ইসরাইল যাতে বিশ্বাস করে। নিশ্চয় তিনি ব্যতীত অন্যকোনো ইলাহ নেই এবং আমি আত্মসমর্পণকারীদের অন্তর্ভুক্ত।' (আল্লাহ তাআলা বললেন,) 'এখন! (এখন এ-কথা বলছো!) ইতোপূর্বে তো তুমি অমান্য করেছো এবং তুমি অশান্তি সৃষ্টিকারীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলে।' [সুরা ইউনুস : আয়াত ৯০-৯১]

আসহাবুল কারইয়াহ অথবা আসহাবু ইয়াসিন

পবিত্র কুরআন ও আসহাবুল কারইয়াহ

পবিত্র কুরআনের সুরা ইয়াসিনে একটি অতি সংক্ষিপ্ত ঘটনা উল্লেখ করা হয়েছে। ঘটনাটি وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ আয়াত থেকে শুরু হয়ে فَإِذَا هُمْ خَامِدُونَ আয়াতে গিয়ে শেষ হয়েছে। সুরার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থাকার কারণে একে 'আসহাবে ইয়াসিন'-এর ঘটনা এবং আয়াতের বর্ণনাশৈলীর অনুসারে 'আসহাবে কারইয়াহ'-এর ঘটনা বলা হয়।

ঘটনা

পবিত্র কুরআন এই ঘটনা সম্পর্কে যতটুকু উল্লেখ করেছে তা এই : অতীত কালে কোনো এক জনপদে কুফরি ও শিরকি এবং নষ্টামি ও নৈরাজ্য দূর করার জন্য এবং সরল পথ ও হেদায়েতের শিক্ষা প্রদানের জন্য আল্লাহ তাআলা দুইজন নবীকে নির্দেশ দিলেন। নবী দুজন জনপদের অধিবাসীদেরকে সত্যের শিক্ষা দিলেন এবং সিরাতে মুস্তাকিম ও সরল পথের আহ্বান জানালেন। কিন্তু জনপদের অধিবাসীরা নবী দুজনকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করলো। ফলে আল্লাহ তাআলা তাঁদের সঙ্গে আরো একজন হেদায়েতকারীকে যোগ করে দিলেন এবং তাঁরা তিনজন মিলে হেদায়েতকারী ও সরল পথ প্রদর্শকের একটি জামাত হয়ে গেলেন। এবার তিনজন একসঙ্গে জনপদের বাসিন্দাদেরকে বিশ্বাস করানোর চেষ্টা করলেন যে, আমরা আল্লাহ তাআলার প্রেরিত হেদায়েতকারী ও সত্যপ্রচারকারী। কিন্তু বাসিন্দারা তাদের কথা শুনলো না; তারা বর্র তাঁদের নিয়ে ঠাট্টা-তামাশা করতে লাগলো : তোমরাও মানুষ এবং আমরাও মানুষ। তোমাদের মধ্যে এমনকি বিচিত্র বস্তু আছে যার কারণে তোমাদেরকে নবী বানিয়ে দেয়া হয়েছে? আসলে এসব তোমাদের মিথ্যাচার, তোমাদের অপকৌশল। নবী তিনজন বললেন, আল্লাহ তাআলা সাক্ষী আছেন যে, আমরা মিথ্যাবাদী নই। তিনি জানেন ও দেখেন; তিনি সবকিছু ভালোভাবেই অবগত আছেন। তারপরও তোমরা আমাদের কথা মানছো না। তোমাদের কাছে সত্য প্রচার করাই আমাদের কাজ; এর চেয়ে বেশি কিছু নয়। আমরা আল্লাহ তাআলার পয়গাম তোমাদের কাছে পৌঁছে দিই এবং তোমাদেরকে সত্যের পথ

দেখাই। জনপদের অধিবাসীরা বলতে লাগলো, আমরা তোমাদেরকে অশুভ মনে করি। তোমরা খামাখা আমাদের এখানে এসে বিশৃঙ্খলা ও ফেতনা সৃষ্টি করছো। তোমরা যদি তোমাদের কর্মকাণ্ড থেকে বিরত না হও তাহলে আমরা তোমাদের তিনজনকেই হত্যা করবো। অথবা কঠিন শাস্তি ও যন্ত্রণার মধ্যে নিক্ষেপ করবো। নবী তিনজন বললেন, আল্লাহ তাআলার নাফরমানি ও অবাধ্যাচরণ করে তোমরা নিজেরাই নিজেদের ওপর অশুভ পরিণাম টেনে আনছো। এর চেয়ে মারাত্মক অশুভ পরিণাম আর কী হতে পারে যে তোমরা উপদেশ ও নসিহত এবং কল্যাণকামিতাকেও গ্রহণ করলে না, বরং বাড়াবাড়ি রকম সীমালঙ্ঘন করে যাচ্ছো।

এই জনপদের এক প্রান্তে একজন সৎ মানুষ বসবাস করতেন। তিনি যখন শুনতে পেলেন জনপদের অধিবাসীরা আল্লাহ তাআলার রাসুল তিনজনকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করছে এবং বিভিন্নভাবে হুমকি-ধমকি দিচ্ছে, দ্রুতই ওই জায়গায় এসে পৌছলেন, যেখানে এ-ধরনের কথাবার্তা হচ্ছিলো। তিনি জনপদের বাসিন্দাদের উদ্দেশে বললেন, হে আমার সম্প্রদায়, তোমরা আল্লাহর রাসুলগণের অনুসরণ করো; এই পবিত্র ব্যক্তিদের অনুসরণ থেকে কোনো তোমরা মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছো? তাঁরা তো তাদের সত্যের প্রচার ও সত্যের শিক্ষা প্রদানের জন্য তোমাদের কাছে কোনো পারিশ্রমিক দাবি করেন নি। তাঁরা তো আল্লাহভক্ত বান্দা ও আল্লাহ তাআলার হেদায়েতপ্রাপ্ত মানুষ। তোমরা আমাকে জবাব দাও, আমি কেনো সেই এক আল্লাহরই ইবাদত করবো না যিনি আমাকে অনস্তিত্ব থেকে অস্তিত্বে নিয়ে এসেছেন? আর মৃত্যুর পর আমাকে এবং তোমাদের সবাইকে তাঁর কাছে ফিরে যেতে হবে। তোমরা যে এই সম্মানিত ব্যক্তিগণকে মিথ্যাবাদী বলছো, তবে আমি তোমাদের জিজ্ঞেস করছি, আমার পক্ষে কি এক আল্লাহকে পরিত্যাগ করে বাতিল মাবুদগুলোকে আমার প্রতিপালক মেনে নেয়া উচিত? সেই একক সত্তা —যিনি অত্যন্ত মেহেরবান ও দয়ালু —যদি আমার কোনো ক্ষতি করার ইচ্ছা করেন, তবে ওই বাতিল মাবুদগুলোর সুপারিশ কার্যকর হবে না এবং তারা ওই ক্ষতি থেকে আমাকে রক্ষাও করতে পারবে না। যদি তোমাদের উদ্দেশ্য এই হয় যে, আমি এই ধরনের কাজ করি, তবে কোনো সন্দেহ নেই যে, আমি কঠিন পথভ্রষ্টতা ও অবাধ্যাচরণের মধ্যে লিপ্ত হয়ে পড়বো। সুতরাং, তোমরা কান খুলে আমার কথা শুনে রাখো, তোমরা এই পবিত্র মানুষদের কথা মেনে নাও; আমি তো ওই সত্তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছি যিনি আমার ও তোমাদের প্রতিপালক।

জনপদের অধিবাসীরা তাদের মিথ্যা প্রতিপন্নকরণ এবং পবিত্র রাসুলগণের সত্যায়নে সৎ মানুষটির এমন দিকনির্দেশনা ও উপদেশমূলক কথাবার্তা শুনে

ক্রোধে তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠলো এবং সৎ মানুষটিকে শহীদ করে দিলো। ঘটনার এই অংশ পর্যন্ত বর্ণনা করার পর আল্লাহ তাআলা বলেন, আমি ওই সৎ মানুষটির সাহসের পুরস্কার হিসেবে তাকে জান্নাত দান করেছি। সে যখন তার পবিত্র আবাসস্থল নিজের চোখে দেখতে পেলো, আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে বলে উঠলো, হায়, আমার সম্প্রদায়ের লোকেরা যদি জানতে পারতো আমার প্রতিপালক আমাকে ক্ষমার কী বিশাল পুরস্কার দান করেছেন এবং আমাকে কোন্ স্তরের মর্যাদা ও সম্মানে অধিষ্ঠিত করেছেন, তাহলে কতই না ভালো হতো!

এরপর আল্লাহ তাআলা বলেন, সৎ মানুষটির সম্প্রদায়ের লোকদের অসৎ ও খারাপ কর্মকাণ্ডের কারণে তাদেরকে ধ্বংস ও শাস্তি দেয়ার জন্য আমার আসমান থেকে সৈন্যসামন্ত প্রেরণ করার প্রয়োজন পড়ে নি; একটি ভয়ঙ্কর নিনাদ তাদের সবার কর্ম সেরে দিয়েছে। তারা যে যেখানে ছিলো সেখানেই মরে পড়ে থাকলো।

অনুমান করি, ওই পাপিষ্ঠরা আল্লাহর রাসুলগণকেও শহীদ করে দিয়েছিলো, কারণ তারা রাসুলগণকে হত্যা করার হুমকি দিয়েছিলো। তবে পবিত্র কুরআনে এ-কথার উল্লেখ নেই। কিন্তু কথা এই যে, উল্লিখিত শাহাদাতবরণকারী সৎ লোকটির কথা উল্লেখের পর রাসুলগণের কথা উল্লেখ করা হয় নি। এই সংকেত ও ইশারা সাক্ষ্য দেয় যে, রাসুলগণকেও শহীদ করা হয়েছিলো।

ঘটনাটি পবিত্র কুরআনে বর্ণিত হয়েছে এভাবে—

وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ () إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ () قَالُوا مَا أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا وَمَا أَنْزَلَ الرَّحْمَنُ مِنْ شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَكْذِبُونَ () قَالُوا رَبُّنَا يَعْلَمُ إِنَّا إِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُونَ () وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ () قَالُوا إِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمْ لَئِنْ لَمْ تَنْتَهُوا لَنَرْجُمَنَّكُمْ وَلَيَمَسَّنَّكُمْ مِنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ () قَالُوا طَائِرُكُمْ مَعَكُمْ أَئِنْ ذُكِّرْتُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ () وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَى قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ () اتَّبِعُوا مَنْ لَا يَسْأَلُكُمْ أَجْرًا وَهُمْ مُهْتَدُونَ () وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ () أَأَتَّخِذُ مِنْ دُونِهِ آلِهَةً إِنْ يُرِدْنِ الرَّحْمَنُ بِضُرٍّ لَا تُغْنِ عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنْقِذُونِ () إِنِّي إِذًا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ () إِنِّي آمَنْتُ بِرَبِّكُمْ

فَاسْمَعُونِ () قِيلَ ادْخُلِ الْجَنَّةَ قَالَ يَا لَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ () بِمَا غَفَرَ لِي رَبِّي وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُكْرَمِينَ () وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى قَوْمِهِ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ جُنْدٍ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا كُنَّا مُنْزِلِينَ () إِنْ كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ خَامِدُونَ (سورة يس)

'তাদের কাছে বর্ণনা করো এক জনপদের অধিবাসীদের দৃষ্টান্ত; যখন তাদের কাছে এসেছিলো রাসুলগণ। যখন তাদের কাছে পাঠিয়েছিলাম দুইজন রাসুল, তখন তারা তাদেরকে মিথ্যাবাদী বলেছিলো, এরপর আমি তাদেরকে শক্তিশালী করেছিলাম তৃতীয় একজন দ্বারা। তারা বলেছিলো, 'আমরা তো তোমাদের কাছে প্রেরিত হয়েছি।' তারা বললো, 'তোমরা আমাদের মতোই মানুষ, দয়াময় আল্লাহ কিছুই অবতীর্ণ করেন নি। তোমরা কেবল মিথ্যাই বলছো।' তারা বললো, 'আমাদের প্রতিপালক জানেন—আমরা অবশ্যই (রাসুলরূপে) তোমাদের কাছে প্রেরিত হয়েছি। স্পষ্টভাবে (সত্য) প্রচার করাই আমাদের দায়িত্ব। (কারো ওপর বল প্রয়োগ করা আমাদের কাজ নয়।)' তারা বললো, 'আমরা তো তোমাদেরকে অমঙ্গলের কারণ মনে করি, যদি তোমরা (দীন প্রচার থেকে) বিরত না হও, তোমাদেরকে অবশ্যই প্রস্তরাঘাতে হত্যা করবো এবং আমাদের পক্ষ থেকে তোমাদের ওপর অবশ্যই মর্মন্তুদ শাস্তি আপতিত হবে। তারা (রাসুলগণ) বললো, 'তোমাদের অমঙ্গল তোমাদেরই সঙ্গে;[৬৮] এটা কি এইজন্য যে, আমরা তোমাদেরকে উপদেশ দিচ্ছি? বস্তুত তোমরা এক সীমালঙ্ঘনকারী সম্প্রদায়।' নগরী প্রান্ত থেকে এক ব্যক্তি[৬৯] ছুটে এলো, সে বললো, 'হে আমার সম্প্রদায়, তোমরা রাসুলগণের অনুসরণ করো; অনুসরণ করো তাদের, যারা তোমাদের কাছে কোনো প্রতিদান চায় না এবং যারা সৎপথপ্রাপ্ত। আমার কি যুক্তি আছে যে, যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন এবং যাঁর কাছে তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে আমি তাঁর ইবাদত করবো না? আমি তাঁর পরিবর্তে অন্য ইলাহ গ্রহণ করবো? দয়াময় আল্লাহ আমাকে ক্ষতিগ্রস্ত করতে চাইলে তাদের সুপারিশ আমার কোনো কাজে আসবে না এবং তারা আমাকে উদ্ধারও করতে পারবে না। এমন কাজ করলে আমি অবশ্যই স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে পড়বো। আমি তোমাদের প্রতিপালকের প্রতি ঈমান এনেছি,

---

[৬৮] কুফরির জন্য তাদের এই অমঙ্গল, উপদেশ দেয়ার জন্য নয়। তারা উপদেশ গ্রহণ করলে অবশ্যই তাদের মঙ্গল হতো।

[৬৯] রিওয়ায়েতে আছে, এই লোকটির নাম হাবিব। শহরের দূর এক প্রান্তে বসবাস করতেন এবং ইবাদতে মগ্ন থাকতেন। রাসুলগণ বিপদে পড়তে পারেন জেনে তাঁদের সমর্থন দেয়ার জন্য দৌড়ে এলেন।

অতএব, তোমরা আমার কথা শোনো।' তাকে বলা হলো, 'জান্নাতে প্রবেশ করো।'[৭০] (জান্নাতে প্রবেশ করার পর) সে বলে উঠলো, 'হায়! আমার সম্প্রদায় যদি জানতে পারতো— কীভাবে আমার প্রতিপালক আমাকে ক্ষমা করেছেন এবং আমাকে সম্মানিত করেছেন।' আমি তার মৃত্যুর পর পর তার সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আকাশ থেকে কোনো বাহিনী প্রেরণ করিনি এবং প্রেরণের প্রয়োজনও ছিলো না। তা ছিলো কেবল এক মহানাদ। ফলে তারা নিথর নিস্তব্ধ হয়ে গেলো। (ধ্বংসপ্রাপ্ত হলো।)' [সুরা ইয়াসিন : আয়াত ১৩-২৯]

মুফাস্সির ও জীবনী লেখকগণকে এই ঘটনার সময় ও বিস্তারিত বিবরণের ব্যাপারে এতটাই সন্দিহান ও দ্বিধাগ্রস্ত দেখা যায় যে, তাঁদের বর্ণনা ও রেওয়ায়েতসমূহের মাধ্যমে ঘটনাটিকে নির্দিষ্ট করা অসম্ভব। এ-কারণে আমরা শুধু এতটুকু বলতে পারি, পবিত্র কুরআনের সবচেয়ে বড় উদ্দেশ্য হলো উপদেশ ও নসিহত—আর এই উদ্দেশ্যের প্রেক্ষিতে ঘটনাটি ততটুকুই বর্ণনা করেছে যতটুকু একজন জ্ঞানী ব্যক্তির জন্য যথেষ্ট ও তৃপ্তিদায়ক। আল্লাহ তাআলার এই জমিনের ওপরে যেখানে সত্য ও মিথ্যার অসংখ্য ঘটনা অতীত হয়ে গেছে আর প্রাচীন আকাশ এ-প্রসঙ্গে যতগুলো ঘটনার সাক্ষী হয়েছে তার মধ্যে এটিও একটি ঘটনা—যা আকাশের নিচে ও মাটির ওপরে সংঘটিত হয়েছে। ওই জনপদ, জনপদের ওই সৎ ব্যক্তি ও রাসুল তিনজনের নাম জানা যাক বা না জানা যাক, মূল ঘটনার মধ্যে এসব কথার কোনো প্রভাব পড়বে না। কেননা, ইতিহাসের যে-পাতাগুলো নুহ আ. ও নুহ আ.-এর সম্প্রদায়, হুদ আ. ও আদ সম্প্রদায়, সালেহ আ. ও সামুদ সম্প্রদায়, ইবরাহিম আ., লুত আ. ও লুত আ.-এর সম্প্রদায়, হযরত মুসা আ. ও ফেরআউন, ইসা আ. ও বনি ইসরাইলের সত্য ও মিথ্যার লড়াইয়ের বিস্তারিত বিবরণ ও ঘটনাবলিকে তার বুকে আজ পর্যন্ত সংরক্ষণ করে রেখেছে, তার মধ্যে যদি এই ঘটনাটিও যুক্ত হয়ে যায়, যার সংক্ষিপ্ত বিবরণ পবিত্র কুরআন উল্লেখ করেছে, তবে আশ্চর্যান্বিত ও বিস্মিত হওয়ার কী কারণ আছে!

ঘটনার সারসংক্ষেপ এই যে, কয়েকজন পবিত্র নবী একটি পথভ্রষ্ট জাতিকে সরল ও সত্য পথ প্রদর্শনের জন্য প্রচেষ্টা করে যাচ্ছিলেন; কিন্তু ওই জাতির লোকেরা অবাধ্যাচরণ ও পথভ্রষ্টতার কারণে তাদের কথা শুনতে অস্বীকৃতি জানালো। এমনকি তারা আল্লাহ তাআলার পথপ্রদর্শনকারী বান্দাগণকে হত্যা করতেও দ্বিধা করলো না। ইতিহাস এই ধরনের ঘটনাবলিকে কেবল

[৭০] আল্লাহর নবীদের সাহায্য করায় বিধর্মীরা তাঁকে হত্যা করে।

বনি ইসরাইলের মধ্যেই এতবার পুনরাবৃত্তি করেছে যে, জাতি ও সম্প্রদায়ের ইতিহাস একমুহূর্তের জন্যও এ-ব্যাপারে ইতস্তত করতে পারে না।

ঘটনাটি সম্পর্কে বক্তব্য

আবদুল্লাহ বিন আব্বাস রা., কা'বা আল-আহবার ও ওয়াহাব বিন মুনাব্বিহ থেকে ইবনে ইসহাক রহ.-এর রেওয়ায়েতে বর্ণনা করেছেন, এটি আন্তাকিয়া (শাম) শহরের ঘটনা। এই শহরের মানুষগুলো ছিলো মূর্তিপূজারী। তাদের বাদশাহর নাম ছিলো আন্তিখিস বিন আন্তিখিস বিন আন্তিখিস (انطيخس بن انطيخس بن انطيخس)। বাদশাহও মূর্তিপূজায় লিপ্ত ছিলো। আল্লাহ তাদের হেদায়েত ও সত্য পথে পরিচালিত করার জন্য তিনজন নবী প্রেরণ করেছিলেন। তাঁদের নাম ছিলো সাদেক, সাদুক ও শালুম[৭১]। আর শহরের শেষ প্রান্ত থেকে যে-সৎ লোকটি নবীদেরকে সমর্থন ও সাহায্য করার জন্য দৌড়ে এসেছিলেন তাঁর নাম ছিলো হাবিব (বিন মিররি)। কেউ কেউ বলেন, এই সৎ মানুষটি ছিলেন আবেদ, দুনিয়াবিমুখ এবং আল্লাহর ইবাদতে কঠোর পরিশ্রমকারী। তিনি শহরের এক দূর প্রান্তে সবসময় ইবাদতে মশগুল থাকতেন। আবার কেউ কেউ বলেন, তিনি রেশম বা সুতির কাপড় বয়নের কাজ করতেন। তিনি অত্যন্ত দানশীল ছিলেন; প্রচুর দান-খয়রাত করতেন।[৭২]

সারকথা, তাঁদের মতে এই ঘটনা হযরত ইসা আ.-এর যুগেরও বহু পূর্বযুগের। আর কাতাদা রা. বলেন, এই ঘটনা হযরত ইসা আ.-এর যুগের এবং এটি আন্তাকিয়া শহরেরই ঘটনা। হযরত ইসা আ. তাঁর তিন সহচর শামউন, ইউহান্না ও পুলাসকে (شمعون، ويوحنا، بولس) আন্তাকিয়া শহরে প্রেরণ করেছিলেন। ইসা আ. তাঁদের নির্দেশ দিয়েছিলেন, তোমরা ওখানে গিয়ে সত্যের প্রতি আহ্বান জানাবে এবং আল্লাহ তাআলার পয়গাম শোনাবে। কিন্তু শহরের অধিবাসী এই তিনজনের কথাকে গ্রাহ্য করে না। তাদেরই জনপদের একজন সৎ মানুষ যখন তাদের সত্য গ্রহণে উৎসাহ দিলেন তখন তারা তাঁকে হত্যা করলো। শুধু তাই নয়, তাঁর মৃতদেহকে পদদলিত করে অবমাননাও করলো। এই সৎ ব্যক্তির নাম ছিলো হাবিব

---

[৭১] কোনো বর্ণনায় আছে, তৃতীয়জনের নাম ছিলো শাকুম।

[৭২] তাফসিরে ইবনে কাসির, সুরা ইয়াসিন; আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ২২৯।

এবং তিনি পেশ ছিলেন কাঠমিস্ত্রি। তখন আল্লাহ তাআলা ওই জনপদের ওপর ভয়ঙ্কর নিনাদের শাস্তি প্রেরণ করলেন। বলা হয়ে থাকে যে, হযরত জিবরাইল আ. এমন ভয়ঙ্কর গর্জন করে উঠলেন, তা শুনে জনপদের অধিবাসীরা যে যেখানে সেখানে সে-অবস্থাতেই মরে পড়ে থাকলো।[৭৩]

পর্যালোচনা

এই রেওয়ায়েত বা বক্তব্যগুলো কা'বা আল-আহবার ও ওয়াহাব বিন মুনাব্বিহ-এর ইসরাইলি রেওয়ায়েতসমূহ থেকে গৃহীত। এমনকি ইবনে ইসহাকের কাছে এই রেওয়ায়েতগুলোর ব্যাপারে পরিপূর্ণ ও ধারাবাহিক সনদ নেই। এ-কারণে তিনি بلغنى (আমার কাছে পৌঁছেছে) বলে রেওয়ায়েতগুলো বর্ণনা করেছেন। আর এ-ধরনের রেওয়ায়েতগুলোকে অনর্থক হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস রা.-এর নাম এসে যাওয়া এবং তাফসিরমূলক কিচ্ছা-কাহিনিগুলোকে সনদহীনভাবেই তাঁর প্রতি সম্পৃক্ত করে দেয়া একটি প্রথায় পরিণত হয়েছে।

এ-কথাগুলো আমি বললাম এ-কারণে যে, দুটি ঘটনাই তাদের বিশ্লেষিত অংশগুলোর প্রেক্ষিতে অনৈতিহাসিক; এমনকি এই অংশগুলো কোনো কোনো সর্বজনগৃহীত ঐতিহাসিক বিষয়কে খণ্ডন করে দেয়। তা ছাড়া পবিত্র কুরআনের আয়াতগুলোর বাহ্যিক অর্থও তার বিপরীত। এ-কারণে বিখ্যাত মুহাদ্দিস ও ইতিহাসবেত্তা হাফেয ইমাদুদ্দিন বিন কাসির লিখেছেন, প্রথম ও দ্বিতীয় ঘটনার ব্যাপারে তো সাধারণভাবে এই প্রশ্ন উত্থাপিত হয় যে, আন্তাকিয়া শহরটি চারটি ইসায়ি শহরের মধ্যে অন্যতম। এই শহরের ব্যাপারে জীবনী রচয়িতা ও ইতিহাসবেত্তাগণের সর্বসম্মতির ভিত্তিতে এটা প্রমাণিত যে, তা হযরত ইসা আ.-এর দীন প্রচারের কেন্দ্র ছিলো। কেননা, বিভিন্ন সময়ে এই শহরগুলোতে যখন হযরত ইসা আ.-এর দাওয়াত পৌঁছে, তখন শহরগুলোর অধিবাসীরা আনন্দ ও উৎসাহের সঙ্গে তাঁর দাওয়াত কবুল করে নেয়। এভাবে তারা হযরত ইসা আ.-এর দীনের দাওয়াত ও প্রচারের ক্ষেত্রে সাহায্য-সহযোগিতাকারী প্রমাণিত হয়েছে। এমনকি হযরত ইসা আ.-এর অনুসারীদের এই বিশ্বাস রয়েছে যে, এই চারটি স্থান পবিত্র স্থান। এ-কারণেই প্রধান পোপের প্রতিনিধিত্বস্থল (دار الخلافة) হলো আল-কুদস (জেরুজালেম), আন্তাকিয়া, ইসকান্দারিয়া ও রোম (ইতালি) এই চারটি শহর।

---

[৭৩] প্রাগুক্ত।

আল-কুদস বা জেরুজালেম এজন্য যে, তা হযরত ইসা আ.-এর জন্মভূমি। আর আন্তাকিয়া এজন্য যে, তার অধিবাসীরা সবাই একসঙ্গে একই সময়ে হযরত ইসা আ.-এর ওপর ঈমান এনেছিলো। আর ইসকান্দারিয়া প্রতিনিধিত্বস্থল এ-কারণে যে, এটাই প্রথম শহর যার অধিবাসীরা সন্ধির সঙ্গে এ-কথা মেনে নিয়েছিলো যে, খ্রিস্টান ধর্মের পবিত্র ব্যক্তিগণ, যথা : পোপ, মিতরান, আসকাফ, কাসিস, শাম্মাস ও রাহেব[৭৪] এই শহরের পূর্ণ স্বাধীনতার সঙ্গে বসবাস করবেন। আর রোম (ইতালি) এ-কারণে যে, তা সম্রাট কনস্টানটাইন (Constantine the Great)-এর রাজধানী ছিলো। তিনি খ্রিস্টান ধর্মকে নতুন ছাঁচে গড়ে উৎকর্ষমণ্ডিত করেছিলেন। হযরত ইসা আ.-এর ধর্মপ্রচারের পূর্বেও কোনো ঐতিহাসিক ঘটনার প্রেক্ষিতে এটা প্রমাণিত হয় না যে, কোনো কালে আন্তাকিয়া নগরীকে আল্লাহ তাআলার গযবে ধ্বংস ও বিধ্বস্ত করে দেয়া হয়েছিলো। পরে তা চাকচিক্যময় শহরে পরিণত হয়েছে। সুতরাং এই ঘটনাকে ইবনে ইসহাকের বর্ণিত রেওয়ায়েত দুটি অনুসারে আন্তাকিয়ার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট করা ঠিক নয়।

আর কাতাদা রা. কর্তৃক বর্ণিত রেওয়ায়েতটির ব্যাপারে উপরিউক্ত প্রশ্ন ছাড়া আরও একটি প্রশ্ন উত্থাপিত হয়। তা হলো : পবিত্র কুরআনের আয়াতগুলোর বাহ্যিক অর্থ বলে, আল্লাহ তাআলার গযবে ধ্বংসপ্রাপ্ত জনপদের হেদায়েতের জন্য যে-পবিত্র ও সম্মানিত ব্যক্তিবর্গকে প্রেরণ করা হয়েছিলো তাঁরা হযরত ইসা আ. বা অন্যকোনো নবীর প্রেরিত, অর্থাৎ, আল্লাহ তাআলার রাসুলের দূত ছিলেন না; বরং তা সরাসরি আল্লাহ তাআলার নবী ছিলেন। কারণ, যদি তাঁরা হযরত ইসা আ.-এর প্রেরিত দূত হতেন, তবে পবিত্র কুরআন অবশ্যই এর প্রতি কোনো-না-কোনো ইঙ্গিত করতো। কিন্তু এমন কোনো ইঙ্গিত নেই। গোটা আলোচনায় তাঁদের ব্যাপারে أرسلنا 'আমি প্রেরণ করেছি' কথাটি বলা হয়েছে। আর এই রাসুলগণ এবং জনপদের অধিবাসীদের কথোপকথনের বাক্যগুলো তখনই কোনো ধরনের ব্যাখ্যা ব্যতীত পরিষ্কার অর্থ প্রকাশ করে যখন তাঁদেরকে সরাসরি আল্লাহ তাআলার রাসুল মেনে নেয়া হয়।

ওই কথোপকথন এমন : যখন পবিত্র ও সম্মানিত ব্যক্তিগণ নিজেদের রাসুল বলে প্রকাশ করলেন, তখন শহরবাসীরা তাঁদের বিরুদ্ধে সেই পুরনো অভিযোগই উত্থাপন করলো, যা আবহমান কাল থেকে রাসুলগণের অস্বীকারকারীরা উত্থাপন করে আসছে। জনপদের অধিবাসীরা বললো,

---

[৭৪] এগুলো পদ ও স্তর বিশেষে পাদরিগণের নাম।

'তোমরা তো আমাদের মতোই মানুষ। তোমরা কীভাবে আল্লাহর রাসুল হতে পারো! আর দয়ালু আল্লাহ তাআলা তোমাদের ওপর কিছুই নাযিল করেন নি। তোমরা মিথ্যা কথা বলছো যে, তোমাদের ওপর আল্লাহর পয়গাম নাযিল হয়েছে।' সুতরাং, তাঁরা যদি সরাসরি আল্লাহ তাআলার রাসুলই না হতেন; বরং হযরত ইসা আ.-এর সহচর হতেন, তবে তাঁরা এখানে স্থানোচিত কথা বলার দাবি অনুসারে এই জবাব দিতেন না যে, 'আল্লাহ তাআলা খুব ভালোভাবেই অবগত আছেন যে, আমরা তোমাদের প্রতি রাসুলরূপে প্রেরিত হয়েছি'; বরং তাঁরা এমন জবাব দিতেন : 'আমরা হযরত ইসা আ.-এর দূত, তোমাদেরকে সত্যের প্রতি আহ্বান করতে এসেছি।' বাকি থাকলো মানুষ হওয়ার ব্যাপারটা। তো আল্লাহ তাআলার রাসুলগণ মানুষই হয়ে থাকেন; তাঁরা ফেরেশতা বা অন্যকোনো সৃষ্টি হন না।[৭৫]

আল্লামা ইবনে কাসির এখানে আরো একটি প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন। কিন্তু তাঁর এই প্রশ্নটি আমাদের কাছে নিজেই জিজ্ঞাসার সম্মুখীন। তাই তা এখানে উল্লেখ করা হলো না।

আবুল কাসেম সুলাইমান আত-তাবরানি তাঁর আল-মু'জামুল কাবির গ্রন্থে বলেন—

عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : السَّبْقُ ثَلَاثَةٌ فَالسَّابِقُ إِلَى مُوسَى يُوشَعُ بْنُ نُونٍ، وَالسَّابِقُ إِلَى عِيسَى صَاحِبُ يَاسِين، وَالسَّابِقُ إِلَى مُحَمَّدٍ صلى الله عليه و سلم عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ

'হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস থেকে বর্ণিত, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, তিনজন মহাপুরুষ রয়েছেন যাঁদের আম্বিয়ায়ে কেরামের নাকিব বা প্রচারকাজের ঘোষণাকারী বলা হয় : ১. হযরত মুসা আ.-এর ঘোষণকারী হলেন হযরত ইউশা বিন নুন; ২. হযরত ইসা আ.-এর ঘোষণাকারী হলেন সাহেবে ইয়াসিন (সুরা ইয়াসিনে যে-তিনজন রাসুলের কথা উল্লেখ করা হয়েছে তাঁরা); ৩. আর হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর ঘোষণাকারী হলেন হযরত আলি বিন আবু তালিব রা.।'[৭৬]

এই হাদিস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, ঘটনায় উল্লেখিত রাসুল তিনজন হযরত ইসা আ.-এর সহচর ছিলেন। কিন্তু মুহাদ্দিসিনে কেরামের কাছে এই

---

[৭৫] তাফসিরে ইবনে কাসির, সুরা ইয়াসিন; ফাতহুল বারি, ৬ষ্ঠ খণ্ড।

[৭৬] আল-মু'জামুল কাবির, হাদিস ১১১৫২।

হাদিসটি অত্যন্ত দুর্বল; এমনকি তা গ্রহণ-অযোগ্য। এই হাদিসের সনদে হুসাইন আল-আশকার নামে একজন রাবী আছেন। তিনি মিথ্যাবাদী এবং তাঁর বর্ণিত হাদিস পরিত্যাজ্য।[৭৭]

ইমাম ইসমাইল বুখারি রহ. এ-ঘটনা সম্পর্কে কোনো রেওয়ায়েত বর্ণনা করেন নি। কিন্তু তিনি আম্বিয়া কেরামের আলোচনায় এই ঘটনাকে হযরত ইসা আ.-এর পূর্ববর্তীকালের ঘটনা বলে উল্লেখ করেছেন। এরপর আয়াতটি উল্লেখ করে তার ভাষাগত বিশ্লেষণ করেছেন। এ থেকে অনুমিত হয়, আল্লামা হাফেয ইমাদুদ্দিন বিন কাসির ও ইমাম ইসমাইল বুখারি রহ.-এর প্রবল মত এটাই যে, এটি হযরত ইসা আ.-এর পূর্ববর্তীকালের ঘটনা।[৭৮] সম্ভবত, এটিই বিশুদ্ধ মত।

সারকথা : ঘটনাটির খণ্ডিত বিবরণ যাই হোক, পবিত্র কুরআন এ-প্রসঙ্গে ঘটনার যে-অংশ বর্ণনা করেছে তা কুরআনের মৌলিক উদ্দেশ্যকে পূর্ণাঙ্গরূপে ব্যক্ত করছে; মক্কাবাসী ও জ্ঞানী ব্যক্তিদের উপদেশ গ্রহণ ও শিক্ষা লাভের জন্য আহ্বান জানাচ্ছে, যাতে তাঁরা তা থেকে উপকৃত হন এবং খাতিমুল আম্বিয়া হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নসিহত ও হেদায়েতের পয়গাম থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে ইহকালে ও পরকালে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার কারণ না হয়।

إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَعِبْرَةً لِأُولِي الْأَبْصَارِ

'নিশ্চয়ই তাতে রয়েছে চক্ষুষ্মানদের জন্য শিক্ষাগ্রহণের উপকার।'[৭৯]

রহমান

আসহাবে কারইয়াহ বা জনপদের অধিবাসীরা মুশরিক ও মূর্তিপূজক ছিলো; কিন্তু তাদের মধ্যে সত্য ধর্মের কিছুটা আলো বিদ্যমান ছিলো। তাদের মধ্যে 'রহমান'-এর ধারণা পাওয়া যেতো। এটা তো বিচিত্র নয় যে—

وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ

'এমন কোনো জাতি নেই যাদের কাছে সতর্ককারী নবী প্রেরিত হন নি।'[৮০]

এই আয়াতের মর্মার্থ অনুযায়ী, তাদের কাছে রাসুল তিনজনের সত্যের দাওয়াত প্রদানের বহুকাল পূর্বে তারা কোনো সত্যনবীর অনুসারী ছিলো।

---

[৭৭] ফাতহুল বারি, ষষ্ঠ খণ্ড।

[৭৮] ফাতহুল বারি, ষষ্ঠ খণ্ড, তাফসিরে ইবনে কাসির, তৃতীয় খণ্ড, সুরা ইয়াসিন।

[৭৯] সুরা আলে ইমরান : আয়াত ১৩।

[৮০] সুরা ফাতির : আয়াত ২৪।

দীর্ঘকাল পরে ধীরে ধীরে তাদের মধ্যে পুনরায় শিরকি ও কুফরি বিস্তার লাভ করেছে এবং তারা তাতে লিপ্ত হয়ে পড়েছে।

উপদেশ ও নসিহত

১। সত্য পথ প্রদর্শন ও পথভ্রষ্টতার ব্যাপারে বাতিলপন্থীদের সবসময় এই বিশ্বাস ছিলো যে, আল্লাহ তাআলার রাসুলের মানুষ হওয়া উচিত নয়; বরং কোনো অস্বাভাবিক সত্তারই আল্লাহর রাসুল হওয়া উচিত। এ-কারণে হযরত নুহ আ. থেকে শুরু করে হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর উম্মতে দাওয়াত পর্যন্ত প্রতিটি জাতিই সবার আগে এ-ব্যাপারে তাদের বিস্ময় ও অবজ্ঞা প্রকাশ করে আসছে যে, কীভাবে এটা সম্ভব হতে পারে যে, আমাদেরই মতো একজন মানুষ এবং আবশ্যক মানবিক গুণাবলির মুখাপেক্ষী মানুষ আল্লাহ তাআলার রাসুল হতে পারেন! এ-কারণে আসহাবুল কারইয়াহর মতো মক্কার মুশরিকরাও হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এটাও বলেছিলো যে—

مَالِ هَٰذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ

'এ কেমন রাসুল যে আহার করে এবং হাটে-বাজারে চলাফেরা করে, তার কাছে কোনো ফেরেশতা কেনো অবতীর্ণ হলো না, যে তার সঙ্গে থাকতো সতর্ককারীরূপে?' [সুরা ফুরকান : আয়াত ৭]

তারা আরো বলেছিলো—

أَبَشَرٌ يَهْدُونَنَا

'মানুষই কি আমাদেরকে পথের সন্ধান দেবে? (আমাদের মতো একজন মানুষই কি আমাদের সরল পথে পরিচালিত করবে?)' [সুরা তাগাবুন : আয়াত ৬]

এবং বলেছিলো—

وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَبَعَثَ اللَّهُ بَشَرًا رَسُولًا

'যখন তাদের কাছে আসে পথনির্দেশ তখন তাদেরকে ঈমান আনা থেকে বিরত রাখে তাদের এই উক্তি, 'আল্লাহ কি মানুষকে রাসুল বানিয়ে পাঠিয়েছেন?'' [সুরা বনি ইসরাইল : আয়াত ৯৪]

কিন্তু পবিত্র কুরআন তাদের অজ্ঞতাসুলভ প্রশ্নের চরম মীমাংসাকারী জবাব দিয়ে চিরতরে এই আলোচনার সমাপ্তি ঘটিয়ে দিয়েছে—

قُلْ لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَسُولًا

'বলো, ফেরেশতারা যদি নিশ্চিন্ত হয়ে পৃথিবীতে বিচরণ করতো তবে আমি আকাশ থেকে তাদের কাছে অবশ্যই ফেরেশতাকে রাসুল বানিয়ে পাঠাতাম।'' [সুরা বনি ইসরাইল : আয়াত ৯৫]

অর্থাৎ তাদের এই প্রশ্নের ভিত্তিই মূর্খতার ওপর স্থাপিত। কারণ, পৃথিবীতে মানবজাতিই বসবাস করছে এবং এখানে ফেরেশতাদের বসতি নেই। সুতরাং মানুষের হেদায়েতের জন্য মানুষেরই আল্লাহর নবী ও রাসুল হওয়া উচিত, ফেরেশতার নয়।

২। যেখানে নষ্টামি, অরাজকতা, ফেতনা ও পথভ্রষ্টতার জীবাণু প্রচুর পরিমাণে থাকে, সেখানে কল্যাণ ও সৌভাগ্যেরও কোনো রুহ বা আত্মা প্রকাশ পেয়ে থাকে এবং তিনি সত্যের বাণীকে সুদৃঢ় করার জন্য প্রাণ বিসর্জন দিতেও দ্বিধাবোধ করেন না। যেমন : আসহাবে ইয়াসিনকে সাহায্য করার জন্য শহরের এক প্রান্ত থেকে একজন পুণ্যবান ব্যক্তি বের হয়ে এলেন; তিনি তাঁর সম্প্রদায়কে উপদেশ দিলেন এবং এর ফলে নিজের প্রাণ বিসর্জন দিলেন। এমনিভাবে হযরত মুসা আ. মিসরে অবস্থানকালে শহরের দূর প্রান্ত থেকে একজন সৎ ব্যক্তি ছুটে এসেছিলেন। তিনি হযরত মুসা আ.-কে তাঁর প্রাণ রক্ষার জন্য সুপরামর্শ দিয়ে তাঁর কর্তব্য পালন করেছিলেন।

ذَٰلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ (سورة الجمعة)

'তা আল্লাহরই অনুগ্রহ, যাকে ইচ্ছা তিনি তা দান করেন। আল্লাহ তো মহা অনুগ্রহশীল।' [সুরা জুমআ : আয়াত ৪]

৩। সত্য ও মিথ্যার লড়াইয়ে সত্যের সত্যতার ও মিথ্যার অসারতার একটি স্পষ্ট প্রকাশ এই যে, সত্য যতই প্রমাণ ও দলিলসমূহের আলোয় নিজের সত্যতাকে উজ্জ্বল করতে থাকে, মিথ্যা তার চেয়েও বেশি অগ্নিশর্মা হয়ে সত্যের আলো থেকে অন্ধ হয়ে প্রমাণ উপস্থিত করার পরিবর্তে যুদ্ধ-বিগ্রহের জন্য উদ্যত হয়ে ওঠে। কিন্তু যাঁরা সত্যের প্রহরী তাঁরা তার কোনোই পরোয়া করেন না। বরং তারা অধিক স্পৃহা ও আশিকসুলভ আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে জান কুরবান করে থাকেন।